প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬০

প্রকাশক—অন্নপূর্ণা ঘোষ
১ নং লালবাগান রোড
কলকাতা



প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
পাবলিসিটি এলিট



মুদ্রাকর—সুকুমার ভট্টাচার্য্য
চণ্ডী আর্ট প্রেস, ৭২/এ বৈঠকখানা রোড



ব্লক—দাসগুপ্ত এণ্ড কোং



প্রচ্ছদ মুদ্রণ—ষ্টাণ্ডার্ড প্রিন্টিং এণ্ড কোং



বাঁধাই—আজাদ হিন্দ্ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্



—দুই টাকা—

১

একডালিয়া ও রাসবিহারীর সঙ্গমে কর্ণফিল্ডের প্রারম্ভে ছোট্ট একটু মাঠ পড়ে আছে ফাঁকা।

পাড়ার বন্ধ্যা গরুগুলি এসে সেখানে ভিড় জমায়। আর ভোর না হতে ভিড় করে গোবরের আশায় নানা বাড়ীর ঝি-চাকর। ডাঃ বোসের চাকর রবি গোবর কুড়িয়েছে অনেকটা। ইঞ্জিনিয়ার বনার্জ্জি সাহেবের বুড়ি ঝি জ্ঞানদা ওর কাছ থেকে কিছুটা গোবর চেয়ে নেয়।

হেমন্তের ঝকঝকে সূর্য্য পূবদিকে মাত্র উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। মিঠে রোদে ভরে আছে চারিদিক। কিছুদিন হ'ল পূজার ধূমধাম কেটে গিয়েছে। মোড়ের মাথায় 'সর্ব্বজনীন্ দুর্গোৎসব' লেখা লাল কাপড়খণ্ড এখনও ঝুলছে। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে রং ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে—লেখাগুলি অস্পষ্ট।

হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ায় কাপড়খানা সশব্দে নৌকার পালের মত ফুলে ওঠে।

সেদিকে তাকিয়ে রবি বসে থাকে। নানা চিন্তার জট মাথার মাঝে পাক খায়।

রাত দু'টার আগে একদিনও ঘুমান যায় না। ডাক্তার বসু আড্ডাদার মানুষ। রাত্রি দশটায় নিজস্ব চেম্বার থেকে ফিরে এসে বাড়ীর রুগী দেখার ঘরে তাসের আড্ডা জমিয়ে বসেন। লোকের অভাব হয় না। আশেপাশের নানা বাড়ী থেকে বাবুরা এসে জমা হয়।

ডাঃ বসুর রোজগার অঢেল। কৃপণ তিনি নন, খেলার ফাঁকে ফাঁকে চায়ের ফরমায়েশ হ'তে থাকে। অত রাত পর্য্যন্ত বাড়ীর কেউ জেগে থাকে না; রবিকেই সামাল দিতে হয়।

সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর দুপুর রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকতে দেহের প্রতিটি অবসন্ন পেশী প্রতিবাদ করে, কিন্তু উপায় নেই। বাবুকে জানালে তিনি নিজের খাটুনীর কথা তুলে উচ্চ হাসিতে ঘর ফাটিয়ে দেন।

তাঁর মেদবহুল দেহের দিকে তাকিয়ে তাঁর অপর্য্যাপ্ত মূল্যবান খাদ্যের কথা স্মরণ করে রবি চুপ করে থাকে।

সকাল সাতটার আগে মনিব-বাড়ীর কেউ ঘুম থেকে ওঠে না। প্রভাতের আঙিনায় শুকতারা যখন মিটি মিটি জ্বলতে থাকে রবির ঘুম তখন ভেঙে যায় অভ্যেসমত। ভাঙ্গা বালতিখানা হাতে তুলে সে বেরিয়ে পড়ে গোবর কুড়াবার নাম নিয়ে। সারা দিনরাত্রির মাঝে এ সময়টাই একটু তার অবসর।

গোয়াল থেকে তাড়ান বন্ধ্যা গরুগুলি মাঠের মাঝে এখানে ওখানে শুয়ে আছে। অযত্নে অস্নানে সারা গায়ে মাটি ও গোবরের চিহ্ন। ডাষ্টবিন্, ড্রেন ও কদর্য্য জঞ্জাল থেকে খাদ্য খুঁজে খেয়ে ওদের বাঁচতে হয়।

রবির দুঃখ হয় গরুগুলির দিকে তাকিয়ে।

বাল্যে গাঁয়ের মাঝে রাখালি ক'রে ওকে জীবন বাঁচাতে হয়েছিল। সেই দুঃখময় দিনগুলিতে গাঁয়ের গরুর দল নিয়ে ওকে ঘুরতে হ'ত মাঠ হতে মাঠান্তরে।

রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বারমাস একপাল অবুঝ বোবাপ্রাণী চরিয়ে বেড়ান যে কি কষ্টকর! এখনও সেকথা মনে করে ওর মাথা ঝিম্‌ঝিম্

করে। তবু সে সময়ের চারপাশের শত গঞ্জনা, শত লাঞ্ছনার মাঝে গরু চরান এবং গরুগুলিই ছিল ওর একমাত্র সান্ত্বনা।

চার বছর বয়সে রবি হারিয়েছিল মা-বাপকে। এক অথর্ব্ব পিসী জীবন-সায়াহ্নে সবটুকু স্নেহ উজাড় করে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস করেছিল নির্ব্বান্ধব ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে। বুড়ো পিসীর আদরে মা-বাপ হারানো দুঃখকে বুঝতে পারেনি সে।

কিন্তু দুটি বছর পার না হতেই পিসী চোখ বুজল। মরবার দিন রাত্তিরে রবিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়েছিল নিত্যকারই মত।

রবি তখন মাত্র ছয় বছরের শিশু। জীবনের সেই অন্ধকারময় আধভোলা আবছায়ার মত দিনগুলির কথা কিছুতেই সে ভুলতে পারে না।

একমুঠো ভাতের জন্য এবাড়ী ওবাড়ী বসে থাকা। কোনদিন শুধু টক্-কুল ও কাঁচা পেয়ারা খেয়ে দিন কাটান; ক্ষিধের জ্বালায় ঘরের দাওয়ায় শুয়ে সারারাত জেগে থাকা; সে এক অদ্ভুত দুঃসহ জীবন।

এভাবে কিছুদিন চলার পর গাঁয়ের রাখাল বুড়ো ভীমদা ওকে নিয়ে নেয় নিজের কাজে। যত কষ্টকরই হোক, উপোষ করার যন্ত্রনা থেকে রেহাই পায় রবি।

কয়েকটা বছর এগিয়ে চলে। একটু একটু করে রাখাল রবি বড় হয়ে ওঠে। রাখালি ছেড়ে ক্ষেত-মজুরী, ঘরামি ও মাছধরার সাকরেদী করে ঘুরে ফিরে। স্বল্প ভাষী, কর্ম্মঠযুবক রবির আদর বেড়ে যায় গাঁয়ের মাঝে। ঘর ছাওয়ান, মাটি কোপান, ধান কাটান, পাট নেওয়ান, —ওর ডাক পড়ে নানা কাজে।

জীবন সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে রবি ভাঙা বেড়ায় ঘেরা…খড়ে ছাওয়া …মাটির দিকে মুখ থোবড়ান পৈতৃক ঘরখানা সারিয়ে নেয় নিজ

হাতে। দিনের শেষে কর্মক্লান্ত শরীরে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে বসে কল্পনার রাশ আল্‌গা করে দেয় নোলক্‌পরা একটা মেয়ের পিছু।

ভিন্‌ গাঁয়ের ঘরামি নীলমণি সর্দ্দারের মেয়ে ক্ষেন্তিকে বড় পছন্দ রবির।

কিন্তু ওর কল্পনা দানা বাঁধবার সুযোগ পায়না, ওর ঘর বাঁধবার সাধ ভেঙ্গে চুর চুর হয়ে যায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের ধাক্কায়। না খেয়ে মরার হাত থেকে বাঁচবার জন্য রবি পালিয়ে আসে সহর কলকাতায়।

গাঁয়ের অন্য দশজনের মত ভিক্ষা করতে বেরিয়ে অযাচিতভাবে কর্ণফিল্ড রোডের পাড়ায় লঙ্গরখানার খিচুরী রাঁধবার চাকুরী পেয়ে যায় সে।

আধ মণ চালডাল একবারে হাঁড়িতে চড়িয়ে দেওয়া এবং তা নাবান,—সে এক এলাহি ব্যাপার। ওর দু'হাতের লোম সব পুড়ে যায় প্রকাণ্ড উনুনের আঁচে।

কিছুদিন এভাবে চলার পর গভর্মেণ্ট থেকে লঙ্গরখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বেকার হয়ে রবি সমিতির সভাপতি ডাক্তার ময়ূরাক্ষ বসুর পেছন ছাড়ে না। ওর ন্যাওটাপনায় অতিষ্ঠ হয়ে ডাঃ বসু ওকে নিজের বাসার জন্য চাকর করে নেয়।

এরপর রবি বহু খুঁজেছিল ক্ষেন্তিকে।

নীলমণি সর্দ্দার গাঁয়ে নেই। মন্বন্তরের ধাক্কায় কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে তা কেউ বলতে পারে না।

গোলগাল, স্বাস্থ্যবতী মেয়েটিকে ভুলতে পারে না রবি। এখনও মাঝে মাঝে রাত দুপুরে সেই টস্‌টসে নোলকপরা মুখের স্বপ্ন দেখে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

সুমুখের রাস্তার উপর একটা ট্যাক্সি বিকট শব্দে হর্ণ বাজিয়ে চলে গেল। সে শব্দে রবির চিন্তায় বাধা পড়ে। চারপাশে চেয়ে দেখে, ঝি-চাকররা সব চলে গিয়েছে যার যার মনিব বাড়ী।

গোবর ভর্ত্তি ভাঙ্গা বালতিখানা হাতে নিয়ে রবি উঠে দাঁড়ায়, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, দ্রুত পা চালায় সে।

মনিব বাড়ীর প্রায় সবাই উঠে পড়েছে ঘুম থেকে। গোবরভরা বালতিখানা বারান্দার এককোনে রেখে উনুনে আগুন ধরিয়ে দেয় রবি।

দোতলা থেকে ডাক্তার-গিন্নী নেমে আসেন। অত্যন্ত অদ্ভুত রকম কৃশ তাঁর দেহ, ডাক্তারের মেদবহুল দেহের পাশে ভারী বেমানান। ডাক্তার তার বিদ্যের ঝুলি উজাড় করেও এক ফোঁটা মাংস বাড়াতে পারেননি স্ত্রীর। সেজন্য তার একটা দুঃখ রয়ে গেছে বরাবর।

হাল্কা দেহ নিয়ে টুক্ টুক্ করে গিন্নী এসে রান্নাঘরে দাঁড়ান। সমস্ত ঘর কয়লার ধোঁয়াতে ভরে আছে। একটা হাতপাখা দিয়ে উবু হয়ে বসে রবি প্রাণপণে উনুনে হাওয়া দিচ্ছে।

একটু পর বাবু ঘুম থেকে উঠবেন, সঙ্গে সঙ্গে চা তৈরী করে হাজির করতে হবে।

দম আটকানো ধোঁয়াতে দাঁড়িয়ে গিন্নী হাঁপিয়ে যান, রবিকে ধমকে বলেন,—আমাদের ঘুম ভাঙ্গবার আগে উনুন ধরিয়ে ফেল্‌বি; ক'দিন বলেছি তোকে এ কথা? গোবর কুড়িয়ে আনবার নাম করে আড্ডা মারা চাই, হতচ্ছাড়া কোথাকার! যা, চার আনার মাখন কিনে নিয়ে আয়।

রবিকে লক্ষ্য করে একখানা চক্‌চকে সিকি ছুঁড়ে বোসগিন্নী বেরিয়ে যান ঘর থেকে

. উনুনে আগুন জলে উঠেছে জোর। কাগজ মোড়ান মাখনের ঢেলা প্লেটের উপর রেখে রবি চায়ের কেট্‌লী চাপিয়ে দেয়। রুটি দিয়ে গিয়েছে রুটিওয়ালা; টুকরো টুকরো করে সেগুলি সে কেটে নেয়। কেটলীর জল শোঁ শোঁ ডাক ছাড়ে। উনুনের উপর থেকে কেট্‌লীটা নামিয়ে কয়েক চামচ চা-পাতা মেপে ছেড়ে দেয়। বাবুর এক ছেলে মাখন খায় না। তার জন্য দু'খণ্ড রুটি ভিন্ন করে রেখে সমস্ত টুকরো-গুলিতে মাখন মাখায়।

উপর থেকে ডাঃ বসুর ডাক ভেসে আসে, রবি দ্রুত হাত চালায়। চায়ের জল ছেঁকে নেয় রঙ্গীন প্লাষ্টিকের পটে; দুধ, চিনি ঢেলে দেয় পরিমাণ মত; বিরাট এক ট্রের মাঝে রুটি, টি-পট, চামচ ও একগাদা কাপ প্লেট সাজিয়ে নিয়ে সে ছোটে উপরমুখো।

খাটের উপর বাবু বসে আছেন চুপ করে। চায়ের কাপে চুমুক না দেওয়া পর্য্যন্ত তার মেজাজ খোলে না। মেঝের উপর গিন্নীকে ঘিরে বসে রয়েছে বাড়ীর এক দঙ্গল ছেলে মেয়ে।

চায়ের ট্রে মেঝেতে নামিয়ে দেওয়ার সাথেই গিন্নী চা ঢালতে আরম্ভ করেন। প্রথম এক কাপ চা পরিপূর্ণ করে এগিয়ে দেন স্বামীর দিকে। ছেলেমেয়েদের জন্য এক কাপ চা ও দুই টুকরো রুটি বরাদ্দ। গিন্নী ভাগ করে দেন রুটি ও চা। রাত্রির উপবাস ভেঙ্গে সবাই কলরব করে খেতে থাকে।

ছোট ছেলেটি আরেক টুক্‌রো রুটির জন্য বায়না ধরে। গিন্নী ধম্‌কে ওঠেন। বাবু খাটের উপর থেকে হাতের খালি কাপটা স্ত্রীর দিকে এগিয়ে ধরেন, গিন্নী পট থেকে ফের এক কাপ চা ঢেলে দেন। নিজের অর্দ্ধেক কাপও ভরে নেন পূর্ণ করে, ছোট মেয়েটা সেদিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে কি যেন বলতে থাকে। খাটের উপর থেকে কর্ত্তা গর্জ্জন

করেন। মেয়ের গোঙানী থেমে যায়, মাথা নীচু করে সে রুটি চিবুতে থাকে।

ছোট লোকদের দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর ধার। ওদের বুভুক্ষু চাউনির সুমুখে ভুক্তদ্রব্য হজম হয় না। ডাক্তার গিন্নীর এ ধারণা নাকি বহু পরীক্ষিত। তাই রবির এ আসরে উপস্থিত থাকা নিষিদ্ধ।

কিন্তু রান্নাঘরে রবির ফুরসৎ নেই। ন'টার ভেতর রান্না অনেক এগিয়ে রাখতে হবে। স্কুলে যারা যাবে তাদের খাইয়ে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে নিত্য ওকে বাজার করে আসতে হয়।

এক কড়া জলে ডাল ছেড়ে কাঁকরভরা চাল বাছতে বসে রবি। নানা আকারের নানা রংয়ের অসংখ্য কাঁকর মিশে আছে চালের মাঝে। মোটা, পচা, বর্মা মালয়—যে রকম চাল হোক্ না কেন ক্ষতি নেই কিন্তু কাঁকর হলেই গিন্নীমার খাওয়া বন্ধ।

বেতন কাটা যাবার ভয়ে রবিকে সাবধানে বাছতে হয় চাল।

উপর থেকে গিন্নী ডাকেন রবিকে। বাছা চালগুলি একপাশে সরিয়ে রেখে রবি উপরে উঠে যায়। এখানে ওখানে ছড়ানো কাপ-গুলি কুড়িয়ে নিয়ে ট্রেতে রাখে। রুটির গুঁড়োতে ভরে আছে মেঝে। সেগুলি ঝাড় দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়।

ছোট্ট একটু টুকুর তুলে গিন্নী রবিকে বলেন,—পটে চা রয়েছে, গরম করে নেগে। আর প্লেটের উপরের রুটির টুকরোটুকুন্ নে যা—বাবু দু'কামড় খেয়েছেন মাত্র, ও কাপেও চা রয়েছে, ছোট্ট খোকা সবটুকু খায়নি। শীর্ণ আঙুল দিয়ে তিনি আধ-খাওয়া লালায় সিক্ত একটা চায়ের কাপ দেখিয়ে দেন।

রবি ট্রে তুলে নেয়।

বাজার করে এসে ব্যাগটা রান্নাঘরের মেঝেতে নামিয়ে রবি পকেট থেকে পয়সা বের করে হিসাব মিলাচ্ছিল।

মাছ কেনায় বড্ড দর পড়ে গিয়েছে। পয়সা মারা মুস্কিল হবে, পটোলে দু'পয়সা এবং মাছে চারটে পয়সা মারা সম্ভব।

ফেরৎ চৌদ্দটি পয়সার মাঝ থেকে ছ'টা পয়সা ভিন্ন করে রবি রেখে দেয় কালীঝুলি মাখা কুলঙ্গির ভেতর। একটা টাকা পুরো হলে সরিয়ে রাখবে পাড়ার মুদির কাছে।

গিন্নীমা রান্নাঘরে নেমে আসেন, রবি দু'আনা পয়সা তার হাতে ফেরৎ দেয়।

পয়সাগুলি প্রসারিত হাতের উপর নেড়ে চেড়ে গিন্নী বলেন,—ক'পয়সার বাজার করে কি নিয়ে এলি ?

রবি উত্তর দেয়—আধসের পোনামাছ এনেছি এক টাকা দিয়ে। পটোল এনেছি একপো চার আনায়, আলু, লঙ্কা, পেঁয়াজও আনতে হয়েছে।

—চৌদ্দ আনার পটোল এক টাকা হয়ে গেল ? গিন্নীমার ভ্রূ কুঁচ্‌কে যায়।

—আজ্ঞে মা ; ও ফ্রেস্ পটোল এনেছি কিনা, তাই সের প্রতি দু'আনা দাম বেশী, একদম জল নেই ওতে, চলুন দেখবেন'খন···

মনে মনে রবি ভাবে—পটোলে পয়সাটা না বাড়ালেই ভাল হ'ত।

মাত্র ছ'টুক্‌রো মাছে আধ সের হয়েছে। এক একটি মাছে দুটি করে খণ্ড করলেও দু'বেলা সবাইর হ'তে চায় না।

গিন্নী একটু চিন্তা করেন।

—এই দেখুন মা !—পটোলগুলি কেমন তাজা ; রবি একটা পটোলে চাপ দিয়ে মাঝামাঝি ভেঙ্গে ফেলে।

—নে—ভেঙ্গে আর নষ্ট করতে হবে না। বঁটিটা নিয়ে আয়, মাছ-গুলি কেটে দি—

রবি বঁটি নিয়ে আসে।

গিন্নীঠাকুরণ কায়দা করে মাছগুলি কাটতে থাকেন, একটা বড়মাছ দু'টুকরো করে স্বামীর জন্য রেখে দেন। বাকী পাঁচটি খণ্ড কেটে পনের টুকরো করেন, তার মাঝ থেকে আবার এক টুকরো নিয়ে ফের দু'টুকরো করেন,—রবির বরাদ্দ।

—মাছগুলি ভাল করে ধুয়ে নে। চট্‌পট্‌ রান্না শেষ করে ভাঁড়ার ঘর পরিষ্কার করবি। বিছানা, বালিশের ওয়াড় খুলে রেখেছি। রান্নার পর উনুনে আঁচ রেখে ওসব সাবান মেখে গরম করে নিবি। পরিষ্কার করে ধোয়া চাই কিন্তু—

রবিকে সমঝিয়ে দিয়ে হাতদুটি সাবান দিয়ে ধুয়ে গিন্নী তর তর করে উপরে চলে যান।

গিন্নীঠাকুরুণ উপরে চলে গিয়েছেন ; স্নানের সময় ছাড়া নামবেন না, ছেলেমেয়েরা সব গিয়েছে ইস্কুলে। বাবু রয়েছেন বাইরে, এদিক ওদিক দেখে রবি এক বাটি ভাত মেখে নেয় ডাল দিয়ে, দু'তিন গ্রাশ খেয়ে বাটিটা আলমারীর এক কোণে রেখে দেয় লুকিয়ে ; মাছ ধুয়ে, মশলা পিষে মাছের ঝোল বসিয়ে দেয়। মাছ ও মশলার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চার পাশে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাটি থেকে দু'এক গ্রাশ করে ভাত খাওয়া চলতে থাকে।··

ধীরে ধীরে বেলা গড়িয়ে যায়। রক্তিম পশ্চিম আকাশে তেজহীন সূর্য্য অস্তোন্মুখ। ক্লান্তিতে ছাদের কানিসের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে

আছে রবি। সাবান-সোডায় ওর আঙুল চুপ্‌সে গিয়েছে। মেরুদণ্ডের দুপাশের মাংসপেশী ব্যথা করে। অতগুলি কাপড় একদিনে না ধুলে ভাল হ'ত। কিন্তু গিন্নীমার কাছে ভাল হ'ত আরও কয়েকখানা কাপড় ধুয়ে দিলে।

এক এক সময় ওর ইচ্ছা হয় গ্রামে ফিরে যেতে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মজুর খাটা এবং বাকী সময় অখণ্ড অবসর;—সেই যে ছিল এর চেয়ে ভাল; কিন্তু!...ঐ ইচ্ছা পর্য্যন্তই দৌড়! দুঃখে কষ্টে সহরের এ জীবনের পাশে পাড়াগেঁয়ে জীবনের টান বড় ফিঁকে, বড় দুর্ব্বল।

—ওরা সব ইস্কুল থেকে এসেছে, ছাদের উপর বসে কি করছিস্? গিন্নীর তীক্ষ্ণস্বর ভেসে আসে নীচ থেকে।

কাপড়ের বোঝা নিয়ে রবি নেমে যায়; গিন্নীমা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, রবিকে দেখে বলেন—আল্‌নার ধারে রেখে চট্ করে ওদের খেতে দেগে, দেরী করিসনে—

ছেলেমেয়েরা রান্নাঘরে কলরব করছিল। রবিকে দেখে ডাক্তার বাবুর বড় ছেলেটি ধম্‌কে ওঠে,—কি ক'চ্ছিলি এতক্ষণ? ক্ষিধেতে আমাদের পেট করছে চোঁ চোঁ; আর উনি ছাদে হাওয়া খাচ্ছেন।

রবি সবাইকে দ্রুত যায়গা করে খেতে দেয়।

ইস্কুলের নানা গল্পগুজবের মাঝে ওরা খেয়ে যায়।

গো-ধূলির অস্পষ্ট আলো-আঁধার নেমে আসে চারপাশে, রাত্রির রান্না চড়াবার এখনও দেরী আছে। সারাদিনে একটুও অবসর পাওয়া যায়নি, ঘরের একপাশে কয়েকটা পিঁড়ি পেতে রবি একটু বিশ্রামের চেষ্টা করে।

ধীরে ধীরে পরিশ্রান্ত দেহে দু'চোখ বুজে আসে, কিন্তু শিশুর তীক্ষ্ণ ডাকে ধড়ফড়িয়ে জেগে যায় সে।

ডাঃ বসুর একটি মেয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলছে—এই রবে! আলো জ্বালিস্ নে কেন? ভূতের মত ঘুমান হচ্ছে। মা ডাকছেন; দেখবে মজা—

সবে ঘুমটা জমে উঠেছিল, বাধা পেয়ে মন তিরিক্ষি হয়ে যায়। রাত্তির না হয় একটু হয়েছে, তাই বলে কানের কাছে এমন করে চীৎকার করতে হবে?

—বসে বসে অমন করে তাকাচ্ছিস্ কেন আমার দিকে? ডাকব মাকে…

—ডাকব মাকে। রবি ভেংচি কাটে। উঠে পিঁড়িগুলি দেয়ালের গায়ে সাজিয়ে রেখে ঘরের সুইচ্‌টা টিপে দেয়। তারপর একটি একটি করে অন্যান্য ঘরগুলির আলো জ্বালে।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বসুর বড় ছেলে ক্লাব থেকে ব্যায়াম করে এসে রবিকে শরীর দলাই মড়াই করে দেবার জন্য ডাক দেয়। প্রতিদিন এ সময় নানা কায়দা করে তার শরীর টিপে দিতে হয়।

খোকাবাবু ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে জামার বোতাম খুলছে। পায়ে তার চক্‌চকে জুতো, পরনে সিল্কের পায়জামা ও সার্ট।

লাইটের আলোতে তার সোনার বোতাম চক্ চক্ করে। লুব্ধ দৃষ্টিতে রবি সেদিকে চেয়ে থাকে। মনের কোনে কি যেন ঘুমিয়ে পড়া সখ নড়াচড়া করে।

ওর দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে চেয়ে খোকাবাবু বল্লে,—কিরে চিচিঙ্গে। ভাল করে হাত ধুয়ে এসেছিস্; নখের ফাঁকে কোথাও ময়লা নেই ত?—দেখি তোর হাত…

রবি ওর মশলায় রঙিন হাত সুমুখের দিকে মেলে ধরে, খোকাবাবু ঝুঁকে ভাল করে দেখে নেয়।

—ঠিক হ্যায়, পিঠ থেকে আজকে আরম্ভ কর। শিড়দাঁড়ার উপর জোর দিবি, বুঝলি ?

গায়ের গেঞ্জিখানা খুলে খোকাবাবু মাটির উপর শক্ত হয়ে বসে। রবি তার পেছন দিকে গিয়ে আঙ্গুল চালাতে থাকে।

পিঠ শেষ করে হাত, হাত শেষ করে পা টেপা চলতে থাকে। রবির সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম বেরোয়। হাতের শিরা-উপশিরা ফুলে যায়; আঙ্গুলগুলি অবশ হবার উপক্রম, খোকাবাবু আরামে বার বার ঢুলে পড়ছে। মাঝে মাঝে রবির পিঠ চাপড়িয়ে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে।

—খোকা তোর হ'ল ? অনেক রাত হয়ে গিয়েছে—রান্না চাপাতে হবে। গিন্নী তার ঘর থেকে নিয়মিত হাঁক দেন।

—এই হ'ল মা ! এই রবি ; চট্ করে দে ঘাড়টা—

খোকাবাবু ঘাড় বাগিয়ে সোজা হয়ে বসে।

রবি দু'হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে তার ঘাড়ের উপর চাপ দিয়ে চলে।

একটু পরে খোকাবাবু ওকে ছুটি দেয়। রবি হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

২

ডাঃ বসু তার রুগী দেখার ঘরে বসে রুগী দেখছিলেন, একপাশে তাকিয়ে তিনি অনুযোগ করেন ;—ওরকম করে চিকিৎসা চলে না মিস্ত্রী, যখন ঠেলা দেবে তখন এসে ইনজেক্‌শান করিয়ে যাবে। একটু কমল ত ব্যস্ ! আর পাত্তা নেই···

অবনী মিস্ত্রী মাথা নীচু করে হাসতে থাকে। কোন উত্তর দেয় না।

—অমনি হাসলে চলবে না। ধরে বেঁধে একবারে চিকিৎসা শেষ করিয়ে ফেল, রোগ পুষে রাখা আমাদের ভাল লাগে না।

অবনী ডাঃ বস্থর বহুদিনের পুরোনো রুগী। পাঁচ বছর আগে ডাঃ বস্থ যখন শ্যামবাজারের একটা ডিস্‌পেনসারিতে বসতেন, তখন থেকে সে তাকে দিয়ে এমনি অনিয়মিতভাবে ইন্‌জেক্‌শান করিয়ে যাচ্ছে, প্রতিবার ইন্‌জেক্‌শানের সাথে অসংখ্য উপদেশ শুনতে হয়, শুনে শুনে অভ্যেস হয়ে গেছে! ডাক্তারের উপদেশবান বন্ধ করার জন্য সে পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটি নোট টেবিলের উপর রাখে।

ইন্‌জেক্‌শান দেওয়া যায়গাটা হাত দিয়ে সামান্য চেপে অবনী বলে, —অত ব্যথা হচ্ছে কেন ডাক্তারবাবু?

চশমার ফাঁক দিয়ে ডাক্তার বস্থ কট্‌মট্‌ করে তাকায় অবনীর দিকে। একটু হেসে বলেন,—ভীমরুলের চাকে মধু খুঁজতে গিয়েছ, হুলে যন্ত্রণা হবে বই কি!

ডাঃ বস্থর ঘর থেকে অবনী রাস্তায় বেরোতেই রবি পেছনে এসে দাঁড়ায়।

পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে রবিকে দেখে অবনী বলে।

—কি গো মশাই! একটা বিড়ি দাও দিকি, তারপর তোমার খোঁজ খবর নেওয়া আরম্ভ করো।

রবি ট্যাক্‌ থেকে দুটো সিগারেট ও দেয়াশলাই বের করে একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় অবনীর দিকে, অন্যটা ধরিয়ে নেয় নিজে।

নিজ থেকে অবনী কিছু বলে না দেখে রবি আরম্ভ করে।

—কিছু বন্দোবস্ত করলে মিস্ত্রীদাদা? আর এক মুহূর্ত্ত যে হাঁড়ি মাষ্টারি করতে ইচ্ছা করে না।

এক মুখ ধুঁয়া ছেড়ে অবনী বলে,—একটু দেরী করতে হবে ভাই।

দু'তিন মাস বাদে ছাঁটাই হবে, সে ফাঁকে তোমাকে ঢুকিয়ে দোবই। তাছাড়া আমাদের কারখানা ত তুমি চেন, মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে খোঁজ নিও।

—আরও দু'তিন মাস!

—কি করব! একটু ফাঁক হলেই বাবুদের শালা-সমুন্দিরা ঢুকে যাচ্ছে। আচ্ছা তুমি চিন্তা করোনা। অন্য চেষ্টাও আমি দেখব; দেখি কি করতে পারি—

সার্কুলার রোড থেকে আরম্ভ হয়ে ছোট্ট একটি সরু গলি নানাভাবে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গিয়ে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে শেষ হয়েছে। পুরোনো কলকাতার অন্যান্য গলির মত এটাও স্যাঁৎসেঁতে, আবর্জ্জনা এবং দুর্গন্ধে ভরা।

এই গলির মাঝে কোঠাবাড়ী ছাড়া এখানে ওখানে যেসব বস্তিবাড়ী রয়েছে ছড়ানো। যার বাসিন্দা হচ্ছে স্বল্প বেতনের কর্ম্মচারী, অল্প পুঁজির ব্যবসাদার, কম টাকার রক্ষিতা, দলছাড়া বেশ্যা এবং ঠিকা ঝি। এরা বিশ পঁচিশ ঘর পর পর দাঁড়িয়ে রাস্তা থেকে কলের জল আনে। পোকায় ভরা কুঁয়োর জল নিয়ে ঝগড়া করে। লাইন দিয়ে পায়খানা করে, অবৈধ প্রণয় করে, কলহ আরম্ভ করে মাথা ফাটায়।

ডাঃ বসুর ওখান থেকে বেরিয়ে অবনী এসে এই রকম একটি বস্তির মাঝে ঢোকে।

একটা ঘরের সুমুখে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে অস্ফুট কাৎরানো ভেসে আসছে বাইরে। মেয়েটি অচেনা নয় অবনীর, বহু দিন আগে সে পর পর দুরাত কাটিয়েছিল এর সাথে। বিষাক্ত ব্যাধির

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে মেয়েটি, অসহ্য লাগে অবনীর, দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে যায়।

মায়ার দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলছে। অবনী পকেটে চাবি খোঁজে, সুমুখ দিয়ে সিক্ত বস্ত্রে স্নান করে যাচ্ছিল একটি মেয়ে। অবনী ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, মায়া কোথায় রে মনি ?

মনির মুখে একটু হাসি ফুটেই মিলিয়ে যায়। সারারাত জাগরণে ক্লান্ত লাল চোখ দুটি তুলে—

সে বললে, পূজো দিতে কালীঘাট গিয়েছে ওরা

—ওঃ! তুমি যাওনি যে ? হেসে প্রশ্ন করে অবনী।

একটু ভেবে নেয় মনি। বলে, কাল রাতে একটুও ঘুমুতে পারিনি। পর পর তিনটি গেঁথেছিলাম, শরীরটাকে একটু বিশ্রাম না দিলে কি চলে ? তুমিই বল অবনী দা···

—বে-জোড় ক'রে থেগেছ ? অমঙ্গল হবে, জোড় পুড়িয়ে নাও। অবনী মনির দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

—ইস্! মায়া অপ্সরী থাকতে আমাদের দিকে নজর পড়বে কর্ত্তার আমরা যে শাঁক-চুনি···ভাগারের মরা।

মনি অবনির দিকে একটা কটাক্ষ হেনে, শুরু কোমরে হিল্লোল তুলে পা চালিয়ে চলে যায়।

মায়ার উপর একটা হিংসা আছে ওদের প্রথম দিন থেকে। মনের মাঝে অবনী গর্ব্ব অনুভব করে সেজন্য। বাস্তবিক এ পল্লীর মাঝে আরও অনেক রক্ষিতা রয়েছে, তাদের সরে ঝগড়া-বিসংবাদ লেগেই আছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মায়া এবং ওর ভেতর একদিনের তরেও সৃষ্টি হয়নি কোন মনোমালিন্য। অবনী পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে মায়াকে। ঐ ডাগর

চোখের স্নিগ্ধ চাউনিতে যে থাকতে পারে কোন অসরলতা—ভাবতে চায়না সে।

চাবি দিয়ে তালা খুলে অবনী গা এলিয়ে দেয় সদ্য কেনা নরম বিছানার উপর। একটা মধুর আমেজে ওর দু'চোখ বুজে আসে।



লোহার কারখানার সুদক্ষ মিস্ত্রী অবনী। মোটা বেতনে চাকুরী করে। বয়স প্রায় চল্লিশ, এখন পর্য্যন্ত বিয়ে করেনি। যা রোজগার করে বুড়ি-মা এবং একাকী নিজের সংসারে খরচ করে বেঁচে যায় বেশ কিছু, কিন্তু এক পয়সা হাতে রাখতে পারে না সে।

রোজগারের টাকা অর্দ্ধেক ভাগ করে ফেলে দেয় মা গিরির হাতে, বাকী টাকা রেখে আসে দেহ-পসারীনি মায়ার কাছে।

কি যে মন্ত্র করেছে মায়া। পোষা কুকুরের মত অবনী তামিল করে ওর নানা আব্দার ও ফরমায়েস। এর আগে এমন করে অবনী আর কোথাও আটুকে যায়নি, টাকা দিয়ে সে বহুবার বহু নারী কিনেছে, যতটুকু আদায় করার আদায় করে চলে এসেছে। কি কুক্ষনে মায়া এসে ঘর বাঁধল কলকাতায়। যৌবনমণ্ডিত সুশ্রী তনু, বড় বড় স্নিগ্ধ দুটি চোখ,—অবনীর মাথা ঘুরে যায়।

সেদিন ছিল বৃষ্টিতে ভেজা ঠাণ্ডা রাত। অবনী ঘুরছিল সারারাত কাটাবার জন্য পছন্দ মত ঘর খুঁজে, কিন্তু পছন্দ ঠিক হচ্ছিল না কাউকে। অবনীর চেনা সে অঞ্চলের একজন লোক হেসে বলে, কি গো মিস্ত্রী! উঁকিঝুঁকি দিচ্ছ কেন? এগিয়ে এসো—ভাল ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল নবাগতা মায়া। তাকে দেখিয়ে লোকটা

ফিস্ ফিস্ করে বলে, কেমন পছন্দ হয়? বোষ্টম-দি নিয়ে এসেছে নবদ্বীপ থেকে, বেশী হাত ফের হয়নি।

মায়া দুটি স্নিগ্ধ চোখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অবনীর দিকে তাকায়। এ দৃষ্টি অবনীর কাছে সম্পূর্ণ নতুন। বেশ্যার নির্লজ্জ জ্বলন্ত হলুদে চোখের দৃষ্টি এ নয়, অবনী মুগ্ধ হয়।

সে রাতের পর কত রাত কেটে গেল। মায়াকে ছেড়ে অবনী নড়েনা। সে নতুন করে মায়ার ঘর সাজায়। লেপ, তোষক, বাক্স ও আলমারী কিনে এনে ভরে ফেলে। মায়ার তুষ্টির জন্য ওভার-টাইম খেটে বেশী রোজগার করে। তবু সখ মেটে না। ওর এক একসময় ইচ্ছা হয় মায়াকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে। নিরিবিলিতে ঘর বাঁধতে। এমন কি মায়া রাজী হলে সে বিয়ে পর্য্যন্ত করতে পারে তাকে। তার এ বাসনা দু'চারদিন যে সে প্রকাশ করেনি, তা নয়। কিন্তু মায়ার কাছ থেকে সাড়া পায়নি মোটেই।

প্রথম দিকে মায়ার মনেও হয়ত এমনিধারা একটা প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা ছিল। গেরস্থঘরের মায়া এ পথে এসে দাঁড়ালেও তাঁর মনের সুপ্ত নীড় বাঁধবার বাসনা বিলুপ্ত হয়ে মুছে যায়নি। স্নেহান্ধ বুড়ো বাপ, মোমের পুতুলের মত ফর্সা-ফ্যাকাশে মা, দোয়েল শালিক শিষ্ দেওয়া গাছের ছায়ায় ঢাকা ছোট্ট ঘর, বাড়ীর পেছনের এঁদো ডোবা, পল্লীর শান্ত পরিবেশ, কোথায় সব হারিয়ে গেল।

তাই বলে মায়া আস্থা স্থাপন করতে পারে না অবনীর অভীপ্সার 'পর। ওর যৌবনমণ্ডিত দেহের সান্নিধ্যে এসে আজ অবনী বুঁদ হয়ে আছে। এখন হয়ত মায়াকে তার অদেয় কিছুই নেই। কিন্তু বয়স যখন পড়ে যাবে। মাংসপেশীর বন্ধনীতে যখন আসবে শিথিলতা। তখন—তখন কি সে অপটু দেহের বোঝা বইবে অবনী? বিগতা যৌবনা বার-নারীর ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে মায়া শিউরে ওঠে।

৩

খোকাবাবুর ঘর ঝাড় দিচ্ছিল রবি। ঘরের একপাশে আলমারীতে বই সাজান। মেঝেতে ছোট্ট একখানা টেবিল ও চেয়ারপাতা, দেয়ালে নানা দেশের ব্যায়ামবীরদের ছবির বাহার।

রবি খুঁটে খুঁটে দেখছিল ঘরখানা, হঠাৎ ওর চোখ জ্বলে ওঠে, কাগজপত্রের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে খোকাবাবুর চক্‌চকে সোনার বোতাম।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সে টেবিলের সুমুখে দাঁড়ায়, ভীতত্রস্ত চোখে তাকায় চারপাশে। কোথাও কেউ নেই, ওর দেহের রক্তের চলাচল বন্ধ হয়ে আসে যেন, হাতের আঙ্গুলগুলি কাঁপতে থাকে। মরীয়া হয়ে সে টেবিলের উপর থেকে তুলে নেয় বোতামছড়া।

জীবনের প্রথম বড় চুরি।

অক্টোপাশের মত একটা ভয় চেপে ধরে রবির মস্তিষ্ককে। দুপুরে খেতে বসে দু'মুঠি ভাত খেয়েই উঠে পড়ে। পেটের ক্ষিধেও মরে গিয়েছে যেন। একটা দুঃসহ অসোয়াস্তি সমস্তদিন কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে থাকে ভেতরটা।

বোতামছড়া যায়গামত রেখে আসার জন্য মনের মাঝ থেকে বার

কয়েক ধাক্কা দেয়। কিন্তু পারে না ফিরিয়ে দিয়ে আসতে। একটা গোপনলোভ পিছু টেনে রাখে বার বার।

খোকাবাবু ইস্কুল থেকে ফিরে এসেছে, বোতামের খোঁজ এখনও পড়েনি। কাজ করার ফাঁকে রবি দু'কান খাড়া করে রাখে।

সন্ধ্যার পর খোকাবাবুর শরীর দলাই মড়াই পর্যন্ত হয়ে যায় নির্বিঘ্নে। রাতের আঁধারে রবির ভয় কমে আসে একটু। উনুনে ভাত চড়িয়ে রবি ভাবে—কিছুদিন পর সরে পড়া যাবে। মুদির কাছে যে টাকা রয়েছে জমান, তাতে ছোট-খাট একটা দোকান কোথাও ফেঁদে বসা যাবে···

উপরে কিসের গোলমাল আরম্ভ হয়েছে। রবির স্বপ্ন-চিন্তায় বাধা পড়ে। ভয়ে রক্তের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।

জ্বলন্ত উনুনের নীচে পোড়া কয়লার টুকরো ও ছাই পড়ে আছে। রবির মাথায় চট করে বুদ্ধি খেলে যায়। কোমর থেকে বোতামগুলি বের করে ছাই চাপা দিয়ে রাখে উনুনের নীচে, তারপর অহেতুক ভাতের হাঁড়িতে হাতা ঢুকিয়ে আধসিদ্ধ চালগুলি নাড়তে থাকে।

—এই শুয়ার! বোতাম কোথায়? খোকাবাবু রবির পিঠে একটা খোঁচা দিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

রবি চমকে উঠে ফ্যাকাশে মুখে ঘুরে দাঁড়ায়।

খোকাবাবুর পেছনে গিন্নীমা ও বাড়ীর ছেলেমেয়েরা।

গিন্নীমা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেন,—এই নিমক্‌হারাম্! নিয়েছিস্ ত দিয়ে দে, নইলে ভাল হবে না কিন্তু ··

ভয়ে রবির জিভ্ আড়ষ্ট হয়ে যায়। কোন উত্তরই তার মাথায় জোগায় না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সে গিন্নীমার মুখপানে চেয়ে থাকে।

খোকাবাবুর লাঠি রবির পেটে টুঁ মারে।

—কোথায় রেখেছিস বোতাম ;—বল্ শিগ্‌গির ? গর্জ্জন করে খোকাবাবুর কণ্ঠ।

মিহি গলায় গিন্নীর পাশ থেকে ফোড়ন কাটে একটি মেয়ে।—কয়েক ঘা ঝেড়ে দাও বড়দা। নইলে ওর পেট থেকে কথা বেরোবে না।

খোকাবাবুর নির্জীব-লাঠি যেন প্রাণ পায় সজীব মানুষের দেহের স্পর্শে। যন্ত্রণায় রবি মুখ বাঁকায়।

রবির চোয়ালে রক্ত দেখে গিন্নী ছেলেকে নিষেধ করেন।—থাক্ চলে আয় খোকা, পুলিশের হাতে দিলেই সব বলবে'খন বাছাধন।

—সেই ভাল হবে মা, রবির মুখের সুমুখে লাঠিটা নাচিয়ে মার পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে যায় খোকাবাবু।

পুলিশের নামে রবির হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যেতে চায়, ব্যথায় জর্জ্জর দেহ নিয়ে সে বসে পড়ে ঘরের এক কোনে।

উনুনের উপর ভাতের হাঁড়িতে জল টগ্ বগ্ করছে। বাষ্পের ধাক্কায় হাঁড়ির ঢাকনি নামা শব্দ করে নেচে উঠছে। ঢাকনি নাবিয়ে দেওয়া দরকার ; কিন্তু রবি বসে থাকে।

পিটুনী খাওয়া বেড়ালের মত রবি খোঁজে পালাবার পথ। বোস-বাড়ী ছেড়ে যেতে মনের মাঝে কেমন করে। ভাল ব্যবহার এখান থেকে সে পায়নি সত্য। কিন্তু লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে যাবার সময় বিদেশ বিভুঁয়ে ময়ূরাক্ষ বোস জায়গা না দিলে সে সময় কি যে অবস্থা হ'ত!—তা সে ভাবতে পারে না।

নিজের উপর রাগ হয় এ ছন্নছাড়া লোভের জন্য। এতদিন যাবৎ এখানে কাজ কচ্ছে, কোনদিন ত এমন লোভ হয়নি। বাবুর সোনার ঘড়ি ; সোনার বোতাম ; সোনার আংটি কতদিন পড়ে রয়েছে টেবিলের উপর, একদিনের তরেও সে সবের জন্য লোভ যায়নি। কিন্তু খোকা-

বাবুর উপর, তার সৌখিনতার উপর বরাবর ওর একটা হিংসা রয়ে গেছে। সে শত চেষ্টা করেও খুঁজে পায় না এর কারণ।

মনিবপুত্রের সাথে সামান্য চাকরের হিংসা চলতে পারে না, এ সে বোঝে ঠিক কিন্তু পারে না বোঝাতে মনের হিংস্রক অংশটাকে। খোকা-বাবুর সোনার বোতাম পড়ে আনার পর থেকে সেই হিংসা শতগুণ হয়ে বেড়ে উঠেছে। আপ্রাণ চেষ্টা করে রবি হার মানে অবাধ্য মনের কাছে।

রান্নাঘরের ড্রেনের কোথাও বাসা করেছে ঝিঁঝিঁ পোকা। ওদের একঘেঁয়ে গান আরম্ভ হয়েছে। কলের ধারে কলের জল পড়ে যাচ্ছে শির শির শব্দ করে। উনুনের উপর মাড়পোড়া দুর্গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠেছে।

রবি আর দেরী করে না, রান্নাঘরের কুলঙ্গি থেকে খুচরো পয়সা এবং উনুনের নীচ থেকে বোতামছড়া কোমরে বেঁধে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

মুদির কাছে গিয়ে বাড়ী যাবার কথা বলে জমান টাকা চাইতেই সে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে রবিকে একটা মশলার কৌটো থেকে পাঁচশটি টাকা বের করে দেয়।

ছ'কুড়ি টাকার মধ্যে মাত্র পঁচিশ। রবি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

মুদি ওর ভাব দেখে বলে, বাকী টাকা আমি কয়েকদিনের ভেতর দিয়ে দোব ভাই। গত হপ্তায় তোমার টাকা থেকে মাল নিয়ে এসেছিলুম। তুমি যে এমন হঠাৎ করে বাড়ী যাবে—তা'ত জানতুম না। এ যাত্রা বাড়ী থেকে এসোগে। একটু কষ্ট হবে তোমার···

—পঁচিশ টাকা নিয়ে কি করব?

—খরচ করে ফেলেছি, এখন আমিই বা কি করব বল ?

মুদি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে খদ্দেরদের নিয়ে। হাত এবং মুখের তার কামাই নেই এক মুহূর্ত্তের তরে। বেশ গুছিয়ে বসেছে লোকটি, রবির অস্তিত্ব যেন ভুলে গিয়েছে।

অর্থহীন এ ভাবে বসে থাকা! রবি উঠে দাঁড়ায়।

—হ্যা—ভাই এসোগে! চিন্তা করোনা। বাড়ী থেকে আসছ ত চট্ করে ?

মুদি একজন খদ্দেরের কাছ থেকে পয়সা নিতে নিতে জিজ্ঞেস করে রবিকে।

রাগে উত্তর দেয়না রবি। দোকান ছেড়ে সে বেরিয়ে আসে।

কয়েকদিন পর। প্রখর দ্বিপ্রহর। কলেজ স্কোয়ার রদ্দুরে খাঁ খাঁ করছে। রবি পার্কে ঢুকে খুঁজতে থাকে একটু ছায়ায় ঢাকা স্থান। কিছুটা সময় বিশ্রাম না করলে চলছে না।

পার্কের এক কোনে গাছের ছায়ায় একটি বেঞ্চের উপর সে শুয়ে পড়ে।

ডাঃ বসুর বাড়ী থেকে এসে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের একটা উড়ে হোটেলে উঠেছে সে। খাওয়া দাওয়া হয়ে যায় অতি অল্প পয়সায়। তবু দিনে দশটি আনার কমে কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারে না।

পঁচিশটি টাকার উপর হাত পড়বার আগেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

বাসার চাকুরী নিতে আর ইচ্ছা হয় না।

যতগুলি ছোটখাট ব্যবসা মনে হয়, তার মধ্যে দুধের ব্যবসা পছন্দ হয় ওর।

হিসাব কষে রবি। দশসের মোষের দুধ দশটাকা; দু'সের জল অনায়াসে মেশান যাবে। নির্ঘাৎ দুটি টাকা লাভ—মন্দ কি!

পরদিন নতুন ঝক্‌ঝকে দুধের পাত্র ও সের নিয়ে রবি ঘোরে মধ্য কলকাতার ছোটবড় খাটালগুলিতে। কেউ দিতে চায়না দুধ। বহুদিনের পুরোনো দুধের ব্যবসাদার রয়েছে তাদের বাঁধা!

একটা খাটালে সবে মোষ দুইতে বসেছিল এক মোষ-ওয়ালা। রবির হাতে পাত্র দেখে সে ডাকে। টেনে টেনে তিনটে মোষ দুয়ে মেপে দেয় গরম স-ফেন দশসের খাঁটি দুধ।

খাটালের পাশের একটা কল থেকে দু'সের জল মিশিয়ে রবি ছোটে বাজার মুখো। প্রথম ব্যবসার আনন্দে অধীর হয়ে যায় সে।

শেয়ালদা বাজারে দুধের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা আছে কিছুটা জায়গা। দু'বেলা দুধের হাট বসে এখানে। দুধের পাত্র সুমুখে নিয়ে সারি সারি বসে আছে দুধওয়ালারা।

রবি তার পাত্র নাবিয়ে শরীরের ঘাম মোছে। নূতন লোক দেখে অন্যসব গয়লারা ওকে ঠাট্টা আরম্ভ করে।

ঝক্‌ঝকে ভেজিটেবিল ঘির একটি খালি টিন নিয়ে একজন খদ্দের রবির পাশের গয়লার সুমুখে এসে দাঁড়ায়। গয়লার দুধভর্ত্তি ড্রামে হাত ডুবিয়ে তুলে জলের মাত্রা পরীক্ষা করে সে বলে;

—মাল যেন একটু বেশী মনে হচ্ছে অন্নদা?

অন্নদা হাসতে থাকে।

অন্নদাকে ছেড়ে রবির দুধ পরীক্ষা করে লোকটি আশ্বস্ত হয়। কতটা দুধ আছে তোমার?

—আজ্ঞে; বার সের দুধ নিয়ে এসেছি। রবি আশান্বিত হয়ে উত্তর দেয়।

—বেশ,—দুধটা আমার টিনে তুলে দাও দিকি!

এসেই খদ্দের জুটে গেল। রবি আনন্দিত হয়। সের বের করে দুধ মাপতে থাকে।

কিন্তু দশসেরের উপর কিছুতেই পাওয়া যায় না দুধ। দু'সের জল উবে গেল কোথায়? রহস্য রবির বোধগম্য হয় না। খুলে কাউকে জিজ্ঞেস করতেও পারে না।

—দুধ যে দশ সের হোল; বার সের কোথায়? ঘোষ মশ ই দশটি টাকা রবির হাতে গুণে দিয়ে প্রশ্ন করে।

—বার সের দুধ মেপে নিয়ে এলুম। রবি আমতা আমতা করে।

—ভাল করে মেপে আনবে বুঝ্‌লে। ঘোষ মশাই কাঁধে টিন তুলে নিয়ে সমঝে দেয় রবিকে।

একটি পয়সাও লাভ হ'ল না, খাটুনিই সার। জলের পয়সা অন্ততঃ পাওয়া যাবে এই ছিল ওর ধারণা। হ'ল যে উল্টো।

কিন্তু দু'সের জল কোথায় গেল? প্রশ্নটা কিছুতেই রবি সমাধান করতে পারে না।

নিত্য হোটেলে দই দিয়ে যায় এক দইওয়ালা। জল উবে যাওয়া ব্যাপারটা তার কাছে জিজ্ঞেস করে নিলে হয়।

হোটেলে ফিরে এসে রবি ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে।

পরদিন দইওয়ালা আসবার সাথেই সে গিয়ে তাকে পাকড়াও করে। সমস্ত শুনে দইওয়ালা হো-হো করে হেসে যা বল্লে; —তার মানে হচ্ছে —জল উবেনি; উবেছে ফেনা এবং কমেছে গরম দুধের আয়তন। দই-ওয়ালা তাকে বুঝিয়ে দেয়,—সদ্য দোহান সফেন দুধ ঠাণ্ডা হলেই পরিমাণে কমে যায়।

পরদিন রবি ফেনাছাড়া ঠাণ্ডা খাঁটি দুধ কেনার চেষ্টায় ঘুরে ব্যর্থ

হয়। উপরন্তু খাটালদারদের কাছ থেকে টিট্‌কারী ও উপহাস কুড়িয়ে নিয়ে ফিরতে হয়। এ ভাবে কয়েকদিন ঘুরে হতাশ হয়ে রবি দুধের ব্যবসা ছাড়ে।

এদিকে পর পর কয়েকদিন ঘুরিয়ে মুদি একটি পয়সাও দেয় না রবিকে। বরং রবি একটু চোখ লাল করতেই সে তাকে জানিয়ে দেয় —ডাঃ বসু এসে খোঁজ করে গিয়েছে তার। বেশী মেজাজ দেখালে বাঁকা পথ ধরতে হবে বাধ্য হয়ে।

হোটেলে ফিরে এসে ক্ষোভে দুঃখে রবি কেঁদে ফেলে। এতদিনের কত কষ্ট করে জমান টাকা এমনভাবে মেরে দিল মুদি। কিন্তু কিছু করার যে উপায় নেই। ঘা খেয়ে ব্যবসায় আর সাহস হয় না। হাতের সামান্য টাকা কয়টিও ফুরিয়ে আসছে। শেষ হবার আগে একটা কিছু জোগাড় করে নিতেই হবে।

বসে শুয়ে চিন্তা করে শুধু মাথা ভারী হয়ে ওঠে। কোন সমাধান পাওয়া যায় না। রবি বেরিয়েছিল কাজের চেষ্টায়। নানা পাড়া, নানা রাস্তা ঘুরতে ঘুরতে সে এসে হাজির হয় অবনীর লোহার কারখানার সুমুখে।

গেটের বাইরে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে রবি দেখছিল কারখানা। সারি সারি দশটি চিমনী রয়েছে সাজানো। পাঁচটি চিম্‌নীর মুখ দিয়ে ধুঁয়ো বেরোচ্ছে গল্ গল্ করে। বাকী পাঁচটি রয়েছে স্তব্ধ হয়ে। সু-উচ্চ প্রাচীরের গায়ে একটু দূরে দূরে রয়েছে লোহার প্রকাণ্ড ফটক। প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে পাহারায়।

একটা মাল বোঝাই প্রকাণ্ড লরি গর্জ্জন করতে করতে কারখানার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। এরই সাথে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে রবির ফুস্‌ফুসের সবটুকু হাওয়া টেনে নিয়ে। ডাঃ বসুর বাড়ী চুরি না

না করলে অবনীকে ধরে একদিন এখানে ঢুকতে পারত সে। নিজের হাতে সে-পথও সে বন্ধ করে দিয়েছে।

কয়েকজন শ্রমিক দল বেঁধে গল্প করতে করতে ওর পাশ দিয়ে কারখানায় ঢুকে যায়। কারখানার লালপাথর বাঁধান রাস্তার উপর দিয়ে সশব্দে তারা এগিয়ে চলে। লুব্ধদৃষ্টিতে রবি তাকিয়ে থাকে।

পেছন থেকে কে হাত রাখে রবির কাঁধে। চম্‌কে রবি ফিরে চায়। পেছনে দাঁড়িয়ে মুচ্‌কী হাসছে অবনী মিস্ত্রী।

ধরা পড়ে যাবার ভয়ে রবির মুখ শুকিয়ে পাংশু হয়ে যায়।

ওর মুখের ভাব দেখে অবনী বলে,—ডাক্তার বাবু সেদিন বলছিলেন তোমার কথা। শুনে ভারী মজা হচ্ছিল। সুঁই ফুঁড়িয়ে শালা কম টাকা নেয়নি আমার কাছ থেকে। বেশ করেছ ভাই!

রবি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকায় অবনীর দিকে। নিশ্চয় ঠাট্টা করছে লোকটা। একটু পরেই পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবে।

—ভয় নেই তোমার; আশ্বাস দেয় অবনী শোন! তোমাকে খুঁজ্‌ছিলাম কয়েকদিন যাবৎ। একজন মেশিনম্যান প্রমোশন পেয়েছে, তার যায়গায় লোক নেবে। তোমার কথা বলেছি ম্যানেজারের কাছে। কাল দশটায় গেটে এসো—

রবির সংশয় ভাঙ্গে না। বলে, সত্য আমি চুরি করিনি মিস্ত্রীদা। মিথ্যে বদনাম দিয়ে তাড়িয়েছে আমাকে।

—থাক্ থাক্। আর সত্য কথা বলতে হবে না। কাল সময়মতো এসো। চল্লুম—ডিউটির সময় হয়ে গিয়েছে।

অবনী গেটের ভেতর ঢুকে পড়ে।

সত্যই পরদিন কাজ হয়ে যায় রবির।

প্রকাণ্ড লোহার কারখানা। নাট বল্টু থেকে আরম্ভ করে কড়ি-

বরগা পর্যন্ত তৈরী হয় এখানে। রবির কাজ হ'ল লাল টক্‌টকে নরম লোহার রডগুলি যখন এঁকে বেঁকে সাপের মত মেসিনের মুখ দিয়ে বেরোয় তখন লম্বা সাঁড়াশীতে চেপে ধরে সেগুলি টেনে নিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হয় অন্য একটা মেসিনের মুখে।

ভয়ঙ্কর খাটুনীর কাজ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থেকে ডিউটি দিতে অনভ্যস্ত রবির পা ব্যথায় টন্ টন্ করে। সামান্য বিশ্রাম নেওয়া দরকার। ইতস্তত: করে সে পাশের সহকর্ম্মী যোগেশকে অনুরোধ করে একটু কাজ চালিয়ে নেবার জন্য।

উবু হয়ে হাঁটুতে মুখের ঘাম মুছে যোগেশ রবির দিকে তাকিয়ে বলে, নতুন এসেছ; প্রথম দিকে এমন অসুবিধে হবেই। ধীরে ধীরে সব সয়ে যাবে। ঐ মেসিনের আড়ালে বসে থাকগে—হাত দিয়ে সে দেখিয়ে দেয় একটু দূরে স্তব্ধ হয়ে থাকা প্রকাণ্ড একটা কল্‌কব্জার পাহাড়। খবরদার—ঘুমিয়ে পড়োনা। যোগেশ সাবধান করে রবিকে।

বিরাট লম্বা কারখানা ঘর নানা শব্দে মুখর। নানা আকারের অদ্ভুত দর্শন মেসিনগুলি নানা শব্দ করে অবিরাম কাজ দিয়ে চলেছে। চারিদিকে একটা গতির চাঞ্চল্য। কেবল যোগেশের দেখিয়ে দেওয়া স্থূল বপু মেসিনটি চুপ করে আছে নিষ্ক্রিয় হয়ে। সামান্য একটু আলো-আঁধার লুকোচুরি খেলছে এর চারপাশে।

রবি এই বন্ধ হয়ে থাকা মেসিনের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে তাকিয়ে দেখে সহকর্ম্মী যোগেশকে। লোকটির সুদৃঢ় ছাঁচের মুখ; তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দুই চোখ; সবল পেশীবহুল দেহ; বোতাম ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে বেরোন বুকের কালো লোমের জঙ্গল। একটি কঠিন কঠোর শক্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি। প্রকাণ্ড সাঁড়াশী দু'হাতে চেপে ধরে কোমর থেকে দেহটা সুমুখের দিকে ঝুঁকিয়ে সে নিঃশব্দে দুটো মেশিনে কাজ করে চলেছে।

কখন যে রবি ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। জোর ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে পড়তে পড়তে সামলে নেয়। ওর সুমুখে দাঁড়িয়ে কোট-প্যাণ্ট পরা নাদুস-নুদুস দেহ-বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক।

—নতুন দেখতে পাচ্ছি; কবে যোগ দিয়েছে কাজে? ভদ্রলোক পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে রবিকে।

রবির চোখের ঘুম ছুটে গিয়েছে অনেক আগে। সুমুখে দাঁড়ানো লোকটি যে হোমড়া-চোমড়া কেউ হবে সেটুকু আন্দাজ করে নিতে ওর কষ্ট হয় না। প্রথম দিনই চাকুরীখানা না যায়! নিজের উপর রাগ হয় ঘুমিয়ে পড়ার জন্য।

ভদ্রলোক অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন।

রবি আমতা আমতা করে বলে, আজ্ঞে স্যার! আজ কাজে লেগেছি। সে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকে।

—আজ কাজে লেগেছ; কি নাম তোমার?

—আজ্ঞে, আমার নাম রবি।

—শোন রবি' প্রথমদিন বলে আজ ছেড়ে দিচ্ছি। যাও··· কাজে লেগে পড়। মনে রেখো···ভবিষ্যতে এরকম হোলে কিন্তু রেয়াৎ পাবে না।

—তারপর যোগেশ! ভদ্রলোক রবিকে ছেড়ে যোগেশের দিকে এগিয়ে যায়। পুরোনো লোক হয়ে কোথায় একে চালিয়ে নেবে; তা'নয় বাহাদুরী করে ঘুমুবার ব্যবস্থা করে দিয়েছ। এখন থেকেই বুঝি দল পাকানো হচ্ছে। ছাঁটাইযের কথা চলেছে কিন্তু! একটু সাম্‌লে···

লোকটির মুখে বাঁকানো ছোরার মত হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়।

যোগেশ মাথা নীচু করে কাজ করে চলে। ইন্‌স্পেকটার চলে

যেতেই সে রবিকে বলে, ছাঁটাইর ভয় দেখিয়ে গেল। হেঃ!. বলেই হাসতে থাকে সে।

রবি অবাক হয়ে চেয়ে দেখে—কেমন অদ্ভুত ভয়লেশহীন নিস্পৃহ মুখছবি।

একটুপর টিফিনের বাঁশি বেজে যায়

গেটের বাইরে সস্তা খাবার নিয়ে বসেছে কয়েকজন ফেরিওয়ালা। বাঁকে ঝুলিয়ে একজন নিয়ে বসেছে অঙ্কুরিত ছোলা ও মটর। উনুনের সাথে বেঁধে চায়ের কল্সী ও বয়মভর্ত্তি বিস্কুট নিয়ে বসেছে চা-ওয়ালা। তার পাশে বসে একজন বিক্রী করছে মুড়ি মুড়কী। স্বাস্থ্যের প্রতি যাদের নজর। তারা দু'পয়সার ছোলা মটরের সাথে দু'পয়সার পেঁয়াজ মুড়ি মিশিয়ে খেয়ে নিচ্ছে। অন্যান্যরা কেউ চা বিস্কুট, কেউ মুড়ি মুড়কী খাচ্ছে খুশীমত।

একটা আস্ত ইটের উপর বসে যোগেশ চিবুচ্ছে অঙ্কুরিত ছোলা ও মুড়ি।

রবিকে নিয়ে অবনী একটা ছোট্ট রেষ্টুরেন্টে ঢোকে। সেখানে বসেছিল অবনীর কয়েকজন বন্ধু। এক কাপ করে চা সুমুখে নিযে সবাই মশগুল হয়ে ওঠে নানা গল্পে রবির ঘুমুবার গল্প নিয়ে হাসা হাসি চলে কিছুক্ষণ। কথায় কথায় যোগেশের ছাঁটাইর কথা এসে পড়ে।

গরম চা ফুঁ দিয়ে উড়ে মিস্ত্রী বিশুয়া বলে,—তোমার কি মনে হয় অবনী ভাই! ফের ছাঁটাই হবে নাকি।

—শালারা যেমন বুঁনো ওল—এরাও তেমনি বাঘা তেঁতুল, সুযোগ পেলেই ছাঁটাই করবে, আমাদেরও কিছু লাভ হয়ে যাবে। অবনী উত্তর দেয়।

—কিন্তু! তাই বলে ভাত মারা? অয়েলম্যান নবীন হাজরা একটা বিস্কুট চিবুতে চিবুতে অনুযোগ করে।

—এ শালারা থাকলে কি আমাদেরই ভাত থাকবে? শুধু ভাত নিয়েই নয়; ফাঁক পেলে কবে যে মাথাখানা দু'ফাঁক করে দেবে—ঠিক নেই।

—আমাদের নতুন বন্ধুটিকে তালিম দিয়ে দিয়েছ? একজন শ্রমিক প্রশ্ন করে।

—সে দোর'স্ক্ন; তাছাড়া ওকে দিয়ে একটা চাল চালব। কি হে—পারবে না?

ভেতরের ব্যাপার রবি কিছুই বোঝেনা। তবু মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়।

—বাঘের ঘরে ঢোকাচ্ছ কিন্তু! নবীন হাজরা সাবধান করে।

—সে আমার ঠিক আছে।

কোঁ কোঁ ডাক ছেড়ে টিফিন সমাপ্তির বাঁশি বেজে যায়।

—আজকের দামটা কি তোমার নামেই থাকবে? দোকানী অবনীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

—কেন কত জমেছে? অবনী প্রশ্ন করে।

—তা প্রায় ত্রিশ টাকার কাছাকাছি।

—হুঁ:—বেশ! লিখো আমার নামেই। নবীন '—ছুটির পর মনে করিস্. ম্যানেজারের কাছে যাবার জন্য। কিছু টাকা চেয়ে না নিলে নয়।

৪

আজ বেতনের দিন। অফিস ঘরের সুমুখে চত্বরের উপর শ্রমিকরা বসে জটলা করছে। কারুর মুখ আনন্দোজ্জ্বল, কারুর বিষাদমলিন।

সহকর্ম্মীদের সাথে এককোনে বসে আছে রবি। আজ সে প্রথম হপ্তা পাচ্ছে, আনন্দ যেন চেপে রাখতে পাচ্ছে না। ওর পাশেই বসে আছে যোগেশ।

একধার থেকে একজন শ্রমিক উঠে এসে কুণ্ঠিত স্বরে যোগেশকে বলে, ক'টা টাকা ধার দিও যোগেশ দা—

—অতগুলি ওভার টাইম খেটেও তোমার ধার নিতে হচ্ছে দীনু ?

ম্লান হেসে দীনু উত্তর দেয়, ডাক্তারের বিল ত্রিশ টাকায় দাঁড়িয়েছে। তাকে কিছু দিতে হবে। বাড়ীওয়ালাকেও এ মাসে কিছু না দিলে নয়। তা'ছাড়া ওর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। একেবারে খালী হাতে থাকতে সাহস পাইনে, রুদ্ধকণ্ঠে থেমে যায় দীনু।

—দুঃখ করোনা দীনু। বউর যে চিকিৎসা করতে পাচ্ছ এই যে পরম সান্ত্বনা তোমার।

দীনু চুপ করে থাকে :

একটু দূরে দাঁড়িয়ে খক্ খক্ করে কাশছিল একজন শীর্ণকায় শ্রমিক। কাশির ফাঁকে ফাঁকে সে কান পেতে শুনছিল যোগেশের কথা। দীনু থামতেই সে এগিয়ে আসে। যোগেশকে ছোট্ট একটু সেলাম ঠুকে বলে, দশ টাকার বেশী বিল তুলতে পারিনি এ বারে। শরীরের অবস্থাও একদম কাহিল। এ মাসে কিছু না দিলে ত ভাই সংসার চালাতে পারব না।

—গত মাসে আটটা টাকা নিয়েছ। আবার ও চাইছ। তোমাদের বোঝা উচিত ;—আমার ও একটা সংসার আছে।

—রাগ করোনা যোগেশ, তুমি রাগ করলে নিরুপায় হয়ে আমাদের কিস্তিওয়ালার হাতে গিয়ে পড়তে হবে। তার চেয়ে যে মরে যাওয়াও ভাল। কম্পিত কণ্ঠে জগরূপ উত্তর দেয়।

—সে জন্যই ত অজয়বাবু বার বার বলছেন শক্ত হও। বেতনবৃদ্ধির দাবী তোল। কিন্তু কে শুনছে?

—আমি কি কখন আপত্তি করেছি। করোনা তোমরা ষ্ট্রাইক।

জগরূপের কাশি আরম্ভ হয়। বহু কষ্টে কাশি থামিয়ে সে আবার আরম্ভ করে,—আধপেটা খেয়ে বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে মরছি। এবার না হয় গুলি খেয়ে মরব। একেবারে সব যন্ত্রণা শেষ হয়ে যাবে। বাঁচা যাবে—

জগরূপের কোটরগত দু'টুকরো ফস্‌ফরাসের মত জলজ্বলে ক্ষুদ্র চোখের কোনে জলবিন্দু টল্ টল্ করে।

* * * *

যোগেশের পেছনে বেতন নিয়ে কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে আ'ছে রবি, পকেটে হাত লাগতেই খস খস্ করে নোটগুলি। আনন্দে ও গর্ব্বে মনের মাঝটা ওর ভরে যায়।

গেটের বাইরে পাওনাদার, ভিক্ষুকও সস্তা খাবার সাজিয়ে খাবার-বিক্রেতারা সব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বার যার কাজ নিয়ে।

যোগেশকে দেখে এক মুখ দাড়ি গোঁফ নিয়ে অত্যন্ত লম্বা একজন লোক এগিয়ে আসে। তার ডানহাতটি কনুই থেকে কেটে বাদ দেওয়া।

যোগেশ তার হাতে দুটি টাকা গুঁজে দেয়।

লোকটি টাকা দুটি একবার দেখে নিয়ে যেন বিহ্বল হয়ে যায়। পরক্ষণেই তার ডান হাতটি বাড়িয়ে যোগেশের একটা হাত চেপে ধরে হাঁউ হাঁউ করে কেঁদে ফেলে।

—বাল বাচ্চা নিয়ে হামি যে মরে যাব। এ হপ্তায় দেড় রূপায়া মিলা পিন্‌সিল্ কারখানা ছে। আওর কিছু দে ভাই—

—ও হপ্তায় এসো—

মাথা নীচু করে লোকটি সরে যায়।

রবি প্রশ্ন করে, এ কে যোগেশদা?

যোগেশ রবির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, ওর নাম জয়রাম। আমাদের এখানে কাজ করত। তখনও আমাদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি। জয়রাম ও আমরা জনকয়েক উঠে পড়ে লেগেছিলাম ইউনিয়ন গড়ে তোলার জন্য। আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে জয়রাম মেতে উঠেছিল সবচেয়ে বেশী। অবনীরাও মালিকের সাথে যোগ দিয়ে আমাদের চেষ্টায় বাধা দেবার জন্য গড়ে তুলেছিল একটা নতুন দল।

ঠিক সেই সময়েই ঘটে যায় একটা একসিডেণ্ট। চারিদিকে হুলুস্থুল হৈ চৈ; আমাদের আগেই অবনীরা জয়রামের অচেতন দেহ তুলে নেয় অফিস ঘরে, সেখান থেকে হাসপাতালের গাড়ী এসে নিয়ে যায়।

তিন মাস পর একহাত নিয়ে জয়রাম উঠে দাঁড়াল। এক মাসের বেতন দিয়ে ম্যানেজার বিদেয় করে ওকে। পার্টি থেকে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের হয়।

মালিকপক্ষ প্রমাণ দেয়,—জয়রাম মদ খেয়ে মাতলামো করত। একসিডেণ্টের দিনও তার পকেটে পাওয়া গিয়েছিল একটা মদের

বোতল। অবনী ওদের সাথে কারখানার ডাক্তার পর্য্যন্ত এই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যে; এক্‌সিডেন্টের দিনও জয়রাম ছিল মাতাল।

কান পেতে রবি শুনছিল কথাগুলি। শিউরে ওঠে সে, মিস্ত্রীদাও ছিল সে পিশাচের দলে! বিশ্বাস করতে চায়না ওর কৃতজ্ঞ মন। প্রশ্ন তুলে এ অবিশ্বাসকে পরিষ্কার করতেও সাহস হয় না।

সহকর্ম্মীদের দুঃখ-কষ্টের এমন নগ্নরূপ দেখে ও শুনে রবির মনের আনন্দ ফিঁকে হয়ে যায়। চলা থামিয়ে কখন যে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে খেয়াল নেই।

—ওকি যাবে না?—চলো। অবাক হয়ে যোগেশ রবির মুখের দিকে তাকায়।

রবি পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে যোগেশের দিকে তুলে ধরে বলে, এ টাকা দুটো তুমি কাকেও দিও যোগেশদা—

যোগেশ চম্‌কে রবির মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর রবির কাঁধে হাত রেখে বলে, তোমার মনের পরিচয় পেয়ে বড্ড খুশী হ'লাম রবি। টাকা দিতে চাইছ—রেখে দাও, যখন দরকার হবে আমিই চেয়ে নোব।

হপ্তার পর হপ্তা এগিয়ে চলে। পাশাপাশি কাজ করে এবং যোগেশের সহজ খোলা আন্তরিকতায় রবি মুগ্ধ হয়। বেশী করে ভাল লাগে লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশায় যোগেশের এগিয়ে যাওয়ার সাহসটিকে।

পরোপকারের একটা স্পৃহা রবিকেও ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে। কখনও যোগেশের সাথে কখনও একাকী বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে ঘুরে

দুঃস্থ সহকর্মীদের সে সাধ্যাতীত সাহায্য করে—সহানুভূতি জানায়। মনের আবেগকে মুক্তি দিয়েই সে আনন্দ পায়, দলাদলি সে বোঝেনা —বুঝতে চায় না।

যোগেশের সাথে রবির এতটা হৃদ্যতায় অবনী কিন্তু খুশী। রবির ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিপত্তিতে সে আশান্বিত, আশা করে ভবিষ্যতে রবিকে দিয়ে দুঃস্থ শ্রমিকের মাঝের যোগেশের প্রভাবকে খর্ব্ব করার। সময়েব প্রতীক্ষা করে অবনী।

যোগেশের ওখানে আজ খাবার নেমন্তন্ন হয়েছে রবির।

জীবনে এই প্রথম নেমন্তন্ন পাওয়ার খুশীতে পথ চলছিল সে। রাস্তার পাশে একটা মিষ্টির দোকানের সুমুখে থম্‌কে দাঁড়ায়। একটু ভেবে, কিছু মিষ্টি কিনে নেয়।

বস্তির নিশানা বলে দিয়েছিল যোগেশ।

রবি মাণিকতলা পুলেব পাশে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে বাব কয়েক ঘুরে যায়। ঠিক কবতে পারে না গন্তব্যস্থল।

মিষ্টি হাতে ওকে এভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে অনেকে মুখ টিপে হাসে। কতক্ষণ ঘুরতে হ'ত ঠিক নেই, খালের জলে স্নান করতে আসছিল যোগেশ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে রবি। এগিয়ে গিয়ে যোগেশকে ডাক দেয়।

—কি ঠিকানা বলে দিয়েছ, ঘুরে ঘুরে জীবন শেষ হবার ফিকির। আগে ঘরে চলো, তারপর স্নান করো।

—অনেক ঘুরেছ বুঝি? এ সব কি আবার? রবির হাতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে যোগেশ।

রবি কিছু বলে না, শুধু হাসে, মিষ্টির ঠোঙা যোগেশের হাতে তুলে দেয়।

সযত্নে নিকানো ছোট্ট একটা ঘরের সুমুখে এসে যোগেশ আহ্বান করে—কৈ…কোথায় ?

ঘরের ভেতর থেকে মাথায় কাপড় টেনে একটি বঁধূ বেরিয়ে আসে, তার পাশ ঘেঁসে দাঁড়ায় একটি ছোট্ট ছেলে।

যোগেশ বউর হাতে মিষ্টির ঠোঙাটা তুলে দেয়।

—এ কে…বাবা ? আমাকে একটা দাও মা! আব্দার তোলে ছেলেটি।

ঘোমটার ভেতর থেকে যোগেশের বউ মৃদু ভর্ৎসনা করে ছেলেকে।

—অমন করতে নেই বাদল। তোমার নতুন কাকু কি ভাববে ?

রবির মনের মাঝে খেলে যায় একটা অনাস্বাদিত আনন্দের শিহরণ। সে বলে, ওকে একটা সন্দেশ দিন বৌ-ঠান।

যোগেশের বউ ছেলের হাতে একটা সন্দেশ দেয়।

সন্দেশে কামড় বসিয়ে খুশী মনে বাদল রবির কাছে এগিয়ে আসে। রবির একটা হাত ধরে বলে, তুমি আমার খুব ভাল কাকু !

আনন্দে আপ্লুত হয়ে রবি বাদলকে তুলে নেয় নিজের কোলে :

—রবিকে বসবার আসন দাও, আমি চট্ করে ডুব দিয়ে আসছি।

রবি বলে, তার চেয়ে খালের ধারেই চলো যোগেশদা।

—না…না রদ্দুরে রদ্দুরে ঘুরে কাজ নেই। ঘেমে গিয়েছ, একটু বিশ্রাম নাও ; যোগেশ গলিপথ ধরে দ্রুত পা চালিয়ে বেরিয়ে যায়।

বউ চটের আসন বিছিয়ে দেয় দাওয়ার উপর। ইতঃস্তত: করে রবি উঠে বসে।

রবি ও যোগেশ পাশাপাশি খেতে বসেছে। যোগেশের বউ সযতনে খাওয়াতে থাকে। খাওয়া শেষে অভ্যেসবশে রবি নিজের উচ্ছিষ্ট তুলতে চায়। যোগেশ বাধা দেয়।

ওরা ঘরের বাইরে এসে বসে। ধীরে ধীরে নানা আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়।

ঘরের মাঝে স্বামীর উচ্ছিষ্টগুলির সাথে রবির উচ্ছিষ্টও মাটি থেকে তুলে থালায় রাখছে লক্ষ্মী। কোন বিচার নেই এ প্রীতি ও সেবার মাঝে।

রবির চেতনার একটা নতুন দিক খুলে যায়। নিজের অবজ্ঞাত স্বত্তা সম্বন্ধে এক অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি অনুভব করে সে।

যোগেশের বাড়ী থেকে যখন ছুটি নিয়ে রবি বেরোল রাস্তায় আকাশে পূর্ণচন্দ্র তখন হাস্‌ছে দিগ্‌দিগন্ত উদ্‌ভাসিত করে।

রবি ভাবে, জীবনভোর শুধু অবজ্ঞা কুড়াবার জন্যই সে সৃষ্টি হয়নি তা'হলে। এ বৃহৎ দুনিয়ায় তার মত লোকেরও যায়গা আছে।

৫

সমস্ত দিনটা ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে খুব জোর। ঠাণ্ডা আমেজ পেয়ে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছে রবির। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে কখন! ডিউটির আর দেরী নেই, হন্ হন্ করে সে চলে কারখানা মুখো।

গেটের মুখে এসে ওর গতি রুদ্ধ হয়। নারী, পুরুষ শিশু ও বৃদ্ধের একদল মানুষ কারখানার প্রবেশপথ বন্ধ করে বসে আছে। দলের পুরুষদের মধ্যে অনেককে সে দেখেছে কারখানার নানা বিভাগে কাজ করতে।

এরা মিলের কুলি ব্যারাকে বাস করে। মালিক এদের মাথার উপর একটু ছাউনি তুলে দিয়েই নিশ্চিন্ত। বেড়া ভেঙ্গে পড়েছে, চট্ টাঙিয়ে রেখেছে সেখানে। চাল ফুটো হয়ে জল পড়ে বিছানাপত্তর সব ভিজে গিয়েছে,—অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছে। এতদিন কোন প্রতিবাদ হয়নি, আজকের বৃষ্টিতে দুটো ঘর ধ্বসে গিয়েছে। খুঁটি চাপা পড়ে একটি শিশু মারা পড়ছে। যোগেশ সবাইকে নিয়ে এসেছে ঘর সারানোর দাবী জানাতে। সে ম্যানেজারের সাথে দেখা করার জন্য ভেতরে গিয়েছে। কর্ত্তৃপক্ষ ঘর সারাই করে দিতে রাজী না হলে কর্ম্মীরা কাজে যোগ দেবেনা।

গেটের বাইরে মানুষের মাথা সীমাহীন হয়ে উঠেছে। ম্যানেজারের সাথে কথাবার্ত্তার ফলাফল জানার জন্য তারা উন্মুখ হয়ে আছে।

ইউনিয়ন সেক্রেটারী অজয় বোস, যোগেশ এবং অবনী বেরিয়ে আসে কারখানার ভেতর থেকে।

ভিড়ের মাঝে পথ করে হাতে হাতে একটা টেবিল কোথা থেকে এসে যায়। সেক্রেটারী অজয় বোস টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে বলে, কোম্পানী ঘর সারানোর দাবীতে রাজী নয়। সংগ্রাম করে সে দাবী আদায় করতে হবে। মালিককে বুঝিয়ে দিতে হবে শ্রমিকদের শক্তি। দাবী তুলতে হবে ভাল ঘরের, বেতনবৃদ্ধির, বিনিমূল্যে চিকিৎসার এবং জানাতে হবে ছাঁটাই করা চলবে না। এজন্য দরকার হলে আমাদের কাজ বন্ধও করতে হতে পারে।

জনতার এক কোণ থেকে একজন শুষ্ক চেহারার শ্রমিক চিৎকার করে, বড় বড় বুলি আর শুনতে চাইনে।

সেই মুহূর্তে অবনী টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে ইউনিয়নকে গালাগাল দিয়ে শ্রমিকদের প্রশ্ন করে,—ষ্ট্রাইক চল্লে কে খেতে দেবে ভুখা শ্রমিকদের ? যারা জোর গলায় ষ্ট্রাইকের কথা বলছেন, তাঁরা কি পারবেন একবেলার খাদ্য জুটিয়ে দিতে। চারিদিকের অগণিত বেকারের মাঝে ধর্ম্মঘটীরা নগণ্য। ষ্ট্রাইক হলে মালিক তাদের এনে ঢুকিয়ে দেবে, সে অবস্থাটা একবার ভেবে দেখেছেন কি ?—

শ্রমিকদের মাঝে কলগুঞ্জন আরম্ভ হয়। অবনী অজয় বোসের দিকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নেবে আসে।

যোগেশ টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ায়। উদাত্ত শানিত কণ্ঠে সমস্ত মাঠ ভরে যায়। কি যেন একটা স্বপ্নময় প্রেরণায় তার সমস্ত শরীর কাঁপছে থর থর করে। শ্রমিকরা তার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। যোগেশ বলে চলে —কারখানার প্রথম যুগের দাস-শ্রমিকদের চেয়ে আমরা এগিয়ে

গেছি অনেক দূর। এটা সম্ভব হয়েছে সংগ্রামের ফলে···শত শত শহীদের রক্তদানের ফলে। দালাল সেদিনও ছিল, আজও আছে ··

মিটিংএর মাঠের একপাশে বসেছিল রবি, হাঁ করে সে শুনছিল সবাইরই কথা। একজন এসে রবিকে প্রশ্ন করে, তোমার নাম রবি নয়?

—হ্যাঁ—কেন? বাধা পেয়ে রবির কণ্ঠে ঝাঁজ প্রকাশ পায়।

—অবনীদা ডাকছে তোমাকে।

ওদিকে উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে যোগেশ বক্তৃতা দিচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রবিকে উঠতে হয়।

একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অবনী কি যেন নির্দ্দেশ দিচ্ছিল কতকগুলি লোককে। রবি গিয়ে দাঁড়াতেই লোকগুলিকে বিদেয় করে সে রবিকে বলে, এখানে থাকার দরকার নেই, আমার সাথে চলো কাজ আছে···

মিটিং ছেড়ে যেতে মন চায়না, তবু অবনীকে অস্বীকার করতে পারেনা রবি।

রবিকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে মদের দোকানে ঢুকে অবনী কিনে নেয় দু'বোতল মদ। পথ চলতে চলতে সে কয়েকছড়া বেলফুলের মালা ও কিছু গরম পেঁয়াজিও কিনে নেয়।

সম্পূর্ণ অচেনা অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা বস্তির ভেতর ঢুকে রবি দেখে নতুন দৃশ্য।

সরু রকে সেজেগুঁজে বসে গল্প করছে কয়েকটি মেয়েছেলে।

একটা মদের বোতল দিয়ে রবিকে ঠেলে অবনী বলে, কি গো পছন্দ হয়?

রবির মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। নিশ্চয় এ বেশ্যা বাড়ী।

গেঁয়ো চাষীর ছেলে সে, চাষী মহলে ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছে বেশ্যা-বাড়ী পুরুষের মৃত্যুকে করে দেয় ত্বরান্বিত। ভূতের ভয়ের মত বেশ্যাভীতি ওর কাছে সত্য হয়ে আছে রক্ত-মজ্জার সাথে মিশে।

—কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মিস্ত্রীদা? শঙ্কিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে রবি।

—আঃ—এসো না।

অবনী ওকে নিয়ে একটি ছোট্ট সাজানো ঘরের সুমুখে দাঁড়ায়। ভেতরে মিটি মিটি জ্বলছে হ্যারিকেনের আলো, অবনীর হাতের ফুলের মালা ও পেঁয়াজির গন্ধ মিশে এক হয়ে অদ্ভুত একটা লোভনীয় গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

—মায়া! অবনীর কণ্ঠে মৃদু আহ্বান ধ্বনিত হয়।

অবনীর আহ্বানে ঘরের ভেতর থেকে ত্রস্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে আছে একটি নারী।

—সঙ্গে নিয়ে এলে কোন বন্ধু গো? অবনীর হাতে হাত রেখে প্রশ্ন করে মায়া।

—আলোটা বাড়িযে ভাল করে দেখো, কেমন নতুন নাগর নিযে এসেছি তোমার জন্য।

—যাও যত সব ইয়ার্কি। মায়া ধমকে ওঠে। ঘরের কোন থেকে হ্যারিকেনের আলো বাড়িয়ে নিয়ে এসে সে উঁচু করে ধরে রবির মুখের কাছে। আলোটি কেঁপে যায়। বিহ্বল দৃষ্টি মেলে কি যেন খুঁজে বের করার চেষ্টা করে সে রবির মুখ থেকে।

এতক্ষণ পর রবি ভাল করে তাকায় মায়ার মুখপানে। কয়েকটা সেকেণ্ড মাত্র; বেত্রাহত হয়ে সে পিছিয়ে আসে কয়েক পা। ঘরের

মাঝে আর দাঁড়ায় না, খোলা দরজা দিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে যায়।

আলোটা ধপ্ করে মাটিতে রেখে ঘরের খুঁটি ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মায়া।

সবে একটা মদের বোতল খুলে অবনী বসেছিল ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে। রবিকে ওভাবে তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরোতে দেখে সে অবাক হয়ে যায়। আরও অবাক হয় স্থানুর মত মায়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

অপ্রিয় কিছু ঘটে যাবার ভয়ে সে মদের বোতল বিছানার উপর ফেলে রেখে দৌড়ে মায়ার কাছে এসে দাঁড়ায়। মায়ার প্রেতায়িত বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, কি হয়েছে মাযা, অমন করে তাকিযে রয়েছ কেন?

আস্তে আস্তে এসে মায়া একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ে।

—একে কোথা থেকে নিয়ে এলে তুমি? ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করে মায়া।

—আমাদের কারখানায় কাজ করে। কেন…ও…কে?

প্রশ্নের উত্তর দেয়না মায়া। স্থির পলকহীন দৃষ্টিতে চেযে থাকে খোলা দরজার দিকে,—যেখান দিয়ে বেরিযে গেল রবি। নীচেকার ঠোঁট্‌খানি বার দুয়েক কেঁপে ওঠে ওর, হঠাৎ সে বলে, মদ দাও খাবো—

অবনী গ্লাস ভরে মদ ঢেলে দেয়।

গ্লাসের পর গ্লাস এগিযে চলে। আজ মায়ার তৃষ্ণা যেন মিটেনা কিছুতেই।

সাতদিন যাবৎ চলেছে ষ্ট্রাইক। কোম্পানীর তরফ থেকে অবনীরা নতুন শ্রমিক সংগ্রহ করে কারখানা চালু করার চেষ্টা করে। সেদিন এক লরি নতুন আমদানী করা মজুর নিয়ে অবনীরা ঢুকছিল কারখানায়। ধর্ম্মঘটী কর্ম্মীরা পিকেটিং চালায়। রাস্তায় শুয়ে পড়ে বাধা দেয়। পুলিশ আসে, চলে অনুরোধ উপদেশ, বাক-বিতণ্ডা ও ভীতি প্রদর্শন। আরম্ভ হয় লাঠিচার্জ্জ, ইষ্টক-বর্ষণ, টিয়ার গ্যাস ও গুলিগোলা। ধনী ও দরিদ্রের বিবাদের চিরন্তনী স্বাভাবিক পরিণতি।

এ কয়দিন রবিকে দেখা যায়নি মোটেই। যোগেশদের কারুর সাথেও তার দেখা নেই। অবনীর দলেও তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি।

ক্ষেন্তিকে দেখার পর থেকে রবির মস্তিষ্ক জুড়ে বাসা বেঁধেছে একটা অস্থিরতার জ্বালা। প্রাণপণ চেষ্টা করেও রবি পারে না নিজকে সাম্‌লে নিতে।

ক্ষেন্তিকে এভাবে, এমন অবস্থায় দেখা যাবে কখনও ভাবতে পারেনি সে। ওর মনের গোপনতম কোনে সযত্নে লালন করা ছবিখানার উপর কে যেন এক থাবা ড্রেনের কাদা ছুঁড়ে দিয়েছে। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে, এ দুর্গন্ধ যে অসহ!

মন্বন্তরের শত সহস্র লোকের সাথে ক্ষেন্তি কেন মরে যায়নি? কেন সে বেঁচে রইল—

রবির মাথার ভেতর একটা দাঁতাল পোকা ঢুকে খাব্‌লে খাব্‌লে

খেয়ে চলে ভেতরের তন্তু-বন্ধনী। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ে।

কখন রবি ঘুরে বেড়ায় পথে পথে, আবার কখন ঘরের মাঝে এসে বসে থাকে নিঝুম হয়ে। সেদিন ঘুরতে ঘুরতে বস্তির সুমুখে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব, ক্ষণিক এগুবার পর দেখে এক যায়গায় কয়েকজন লোক উত্তেজিত হয়ে জটলা করছে। মাঝে দাঁড়িয়ে আছে যোগেশ। তার একটা হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আশেপাশের কয়েকজনের দেহেরও নানা যায়গায় আঘাতের চিহ্ন।

বিমূঢ় রবিকে দেখে প্রশ্ন করে যোগেশ।

—কোথায় গা ঢাকা দিয়ে ছিলে এতদিন ?

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে রবি তাকিয়ে থাকে।

রবির দেহে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বিরক্তিভরা কণ্ঠে যোগেশ বলে, এদিকে কি হয়েছে জান তুমি ?

মাথা নীচু করে রবি নিরুত্তরে চুপ করে থাকে।

যোগেশের মুখের পেশী কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে বলে, তোমাকে আজ দেখাব যারা তোমার আমার সাথে মিশে ঘোরাফেরা করে···বড় বড় কথা বলে, দরদী সাজে···তুমি যাদের বন্ধু মনে করো···সেই অবনীদের মহৎ কাজের একটা নমুনা।

রবিকে নিয়ে যোগেশ বস্তির একটি ঘরে প্রবেশ করে।

ঘরের ভেতর একটা আলো জ্বলছে উজ্জল হয়ে। মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটি মানুষের নিঃসাড় দেহ। দেহটির পা থেকে মাথা অবধি সমস্ত শরীর মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা, তার পায়ের কাছে বসে ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে কাঁদছে একটি সুন্দরী তন্বী তরুণী। যে সৌন্দর্য্য শ্রমিকের ঘরে বেখাপ্পা ও বিরল।

যোগেশ এগিয়ে এসে মেয়েটির মাথার উপর হাত রেখে বলে, তুই এখনও বসে বসে কাঁদছিস্ মিনু ?

মিনু মুখ তুলে তাকায়। ভীত ত্রস্ত কান্নায় লাল চোখ দুটি তার মূকও ভাষাহীন।

—আমার এখন কি হবে যোগেশদা, আমাকে যে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, ফুঁপিয়ে ওঠে মিনু।

—তোর কোন ভয় নেই বোন, আমরা এখনও মরে যাইনি। তার পর রবির দিকে চেয়ে বলে, এই দেখো রবি ! এই নিরীহ বুড়োকে পর্য্যন্ত খুন করতে ওদের বাধেনি, যোগেশ মৃতের মুখের চাদর তুলে ধরে।

মৃতের রক্তাপ্লুত পাণ্ডুর মুখের উপর···তার বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লেগে আছে তখনও যেন একটা ভীতির চিহ্ন।

রবির মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে।

যোগেশের দু'চোখ জ্বলে ওঠে, রবির মুখের উপর দৃষ্টি রেখে সে বলে, তোমার একটা কাজ করতে হবে—পারবে ?

রবি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকায় যোগেশের মুখপানে। সুদৃঢ় কণ্ঠে যেন আদেশের সুরেই যোগেশ বলে রবিকে।

—অবনীর সংগ ছাড়তে হবে তোমায় ?

কথাটা শুনে চম্‌কে যায় রবি।

—উত্তর দাও রবি ? যোগেশের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে ফোটে।

পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একজন লোক টিট্‌কিরি দিয়ে বলে,

ওকে কয়েকদিন সময় দাও যোগেশদা, এমন মধুর সংগ কি অত চট্ করে ছাড়া যায় ?

কথাটা যেন চাবুকের মত শিষ্ দিয়ে উঠল রবির কাছে। অবনীর নাম শুনে ঘৃণায় রি রি করে ওর অন্তরাত্মা। অবনী দালাল, অবনী খুনী, এ পরিচয়ই ওর কাছে বড় নয়। এর চেয়েও বড় পরিচয় অবনী লম্পট। অবনী গ্রাস করে আছে ক্ষেন্তিকে। শুধু এইটুকুই যথেষ্ট—

সেই অবনীর সংগ হচ্ছে মধুর ? মনকে মুহূর্ত্তে ঠিক করে নেয় রবি। বলে, বল—আমাকে কি করতে হবে ?

যোগেশের চোখে একটা আশার ঝিলিক দিয়ে যায়। বলে, তোমাকে এ ঘর দখল করে রাখতে হবে। এখনই বিছানাপত্তর নিয়ে উঠে এসো।

রবি ঠিক বুঝতে পারেনা কথাটা।

যোগেশ তাকে বুঝিয়ে বলে, কারখানায় যারা কাজ করে তারাই কেবলমাত্র কুলি ব্যারাকে থাকার অধিকারী। রামসদন মারা গিয়েছে ; কোম্পানী চাইবে মিনুকে এখান থেকে তাড়িয়ে নিজেদের লোক ঢোকাতে। অথচ ব্যারাকে তাদের লোক বেশী হয়ে গেলে আমাদের লোকদের এখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

রবির বিহ্বল দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মিনুর 'পর।

মিনুর চোখের জলের রেখা শুকিয়ে গিয়েছে, একটানা অবাক দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে রবির দিকে।

রবির মনের প্রশ্ন-দ্বন্দ্ব ও ভাবনাগুলি সব গুলিয়ে যায়।

—তুমি ঠিক হয়ে নাও। আমাদের লাশ নিয়ে অনেক হাঙ্গামা পোহাতে হবে। চল্লুম—

যোগেশরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বৃষ্টিতে ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে মন্থর গতিতে। ঘরের ক্ষীণ প্রদীপ বাতাসের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘরে পড়ে আছে মৃতদেহ। নিরাশ্রয়া কন্যা বসে আছে পাশে। একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে চারদিকে।

রবি চিন্তা করে কয়েকঘণ্টা আগেকার ঘটনা। চিন্তা করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের, ভাবে মিনুর কথা। মনে পড়ে ক্ষেন্তির কথা।

নাঃ! ক্ষেন্তির কথা সে কিছুতেই ভাববে না। কেন ভাববে? কি সম্পর্ক তার সাথে? স্বপ্নসৌধ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাক্। অতীত জীবনপাতার সে মধুর দিনগুলি—

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে রবি। মনের মাঝে একটা চাপা কান্না গুমরিয়ে যায়।

কিন্তু—ক্ষেন্তি যে বেশ্যা! পরপুরুষ ভোগ্যা। নিদারুণ ঘৃণায় রবির কপালে কুঞ্চন দেখা যায়। ক্রোধে জ্বালা করে সর্ব্ব অঙ্গ। অসহ ···অসহ্য ভাবা ওর কথা। মরে গিয়েছে ক্ষেন্তি। হ্যাঁ···মরেই গিয়েছে, ওকে ভুলতেই হবে, না···না···কিছুতেই সে ভাববে না ওর কথা।

রবি মিনুর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় নীচের ঠোঁটটা সে চেপে ধরে দাঁত দিয়ে, হ্যাঁ·· মিনুকে ঘিরেই জাগাতে হবে নতুন কল্পনা ···নতুন সম্ভাবনা·· গড়তে হবে নতুন জগৎ।

৬

রবি আবার ফিরে না এসে পারবে না। মায়ার মনের এ আশা বৃথাই যায়। চটে যায় মায়া, ভাবতে চায়না রবির কথা। কি দরকার ভেবে। দুঃস্বপ্নের মতই সে ভুলতে চায় সেদিনের সেই আকস্মিক রবির সাথে দেখা হয়ে যাওয়াটাকে।

সেদিন সে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল এমনিই।

সন্ধ্যার অস্পষ্টতা কেটে গিয়ে রাতের আঁধার গাঢ় হয়ে উঠেছে চারপাশে। রাস্তার উপর দিয়ে ভদ্রলোক বাবুরা চলতে চলতে বস্তিটার দিকে চেয়ে নিচ্ছে। সে চাইবারই বা কত কায়দা। কেউ দূর থেকে গিলতে গিলতে সুমুখে এসে দৃষ্টি ঘুরিয়ে গো-বেচারী সেজে এগিয়ে যাচ্ছে। আবার অনেকে সুমুখে এসে মুখেচোখে নিদারুণ ঘৃণার ভাব দেখাচ্ছে।

মায়ার হাসি পায় বাবুদের কাণ্ড দেখে। কেন বাপু অত লুকুচুরী। সোজা চাওয়া চাইলে কি জাত ক্ষয়ে যাবে ?

—এই...এই শুনচ ! ঘাড়ের পেছনে ডাক শুনে মায়া ফিরে তাকায়।

বড় বড় দুটি চোখ, কাঁধেতে এসে লুটিয়ে পড়েছে চুলের গুচ্ছ। একজন সুবেশবাবু দাঁড়িয়ে আছে। বয়স তার পঁচিশ থেকে ত্রিশের ভেতর, সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহে স্বাস্থ্যের জৌলুশ। প্রশস্ত ললাটে বুদ্ধির দৃপ্তি।

মধুর হাসি হেসে সুমিষ্ট কণ্ঠে লোকটি বলে, তাকিয়ে দেখছো কি ? ঘরে চলো—আলাপ হোক।

গম্ভীর কণ্ঠে মায়া বলে, না—এখানে হবে না।

—ওঃ! বাঁধা আছে বুঝি? তা—একটা গান শুনিয়ে না হয় চলে যাব।

ভারী সুন্দর করে হাসছে বাবুটি। বড় ভাল লাগে মায়ার।

—অত ভাবছো কি গো? নাও এখন চলো—

কথা বলার ধরনটি কত মধুর। মানুষটার বড় বড় কালো চোখে কিসের যেন হাতছানি। গালি দিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারেনা মায়া। ইতঃস্তত: করে লোকটিকে নিয়ে ঘরে এসে ঢোকে।

—বাঃ...বাঃ...বেশ সাজানো ঘর দেখতে পাচ্ছি। আঃ—এত নরম! মায়ার খাটের উপর দেহটা নিক্ষেপ করে লোকটা হাত পা ছড়িয়ে দেয়। একটু সময় চোখ বুজে পড়ে থাকে। তারপর মায়ার দিকে চেয়ে বলে, গান শুনবে না আবৃত্তি?

—আবৃত্তি! সে আবার কি? বিস্ময়ে মায়া প্রশ্ন করে।

—সুর করে কবিতা পাঠ; শোননি কখন?

—মহাভারত পাঠ ত শুনেছি বই কি—

কবির মুখে হাসি দেখা দেয়। সুমধুরকণ্ঠের ঝঙ্কারে ঘর ভরে যায়। কখন পুলকে কখন বিষাদে মায়ার গায়ের লোম কাঁটা দেয়। শুনতে শুনতে দু'চোখ জলে ভরে আসে।

আবৃত্তি থেমে যায়, মায়া থম্ ধরে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলে, আমাকে শেখাবে?

—তুমি শিখবে, আমি শেখাব; এইত চাই, এবার একটা গান শোন। জয়ের আনন্দে গায়কের কণ্ঠ যেন আরও মধুর শোনায়।

গান যখন শেষ হ'ল, ছোট্ট ঘরে লোক আর ধরে না। বাড়ীওয়ালী

এগিয়ে এসে মায়াকে শুধোয় : এ কেলা মায়া? আ-হা-হা যেন নদের নিমাই!

নদের নিমাই-ই উত্তর দেয়, মায়াকে গান শেখাব মাসি।

—তুমি আমাদের মায়াকে গান শেখাবে বাবা? বয়েস থাকলে যে আমিই শিখতুম। এ-লা ছুঁড়ি! হাঁ করে বসে রয়েছিস্ কেন? বাবুকে আদর-যত্ন কর, মিষ্টি এনে খাওয়া, ওরে চল্-চল্ ভিড় করিস্‌নে। একটু হাঁফ ছাড়তে দে, পালিয়ে ত আর যাচ্ছে না—

কথাটা অবনীর কাছে গোপন থাকে না।

সে শুনতে পায় সব, ক্রোধে ও হিংসায় ওর সমস্ত দেহ জ্বলতে থাকে। হাতে নাতে ধরে একটা শিক্ষা দেবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হয়। সময় অসময়ে হানা দিয়েও পাত্তা পায়না বাবুটির। এদিকে মায়ার মধুর ব্যবহারেও নেই কোন ব্যতিক্রম।

অবনীর মাথায় বুদ্ধি খেলে, অসুখের খবর পাঠিয়ে কয়েকদিন যাবৎ সে আসে না মায়ার কাছে।

সেদিন দুপুরে কারখানায় কাজ করতে বসে উন্মাদনা বোধ করে অবনী। ছুটি নিয়ে বেরিয়ে আসে।

মায়া ছিলনা ঘরে, তালা খুলে অবনী ঘরে ঢোকে।

গত রাতের বিছানা তোলা হয়নি। একটা পাশ বালিশ মেঝেতে পড়ে আছে। নিঃশেষিত মদের বোতল ও গ্লাস বিছানার উপর গড়াচ্ছে। আধ-খাওয়া দুটো মাংসের প্লেট ঘরের এক কোণে সরিয়ে রাখা, মাছির ঝাক্ ছেঁকে ধরেছে প্লেট-দুটা। বিছানার উপর একটা বাসি ফুলের মালা।

অবনীর মাথার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অস্থির পদক্ষেপে ঘরময় পায়চারি করে সে। চোখদুটো জলতে থাকে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মত।

কিছুক্ষণ কেটে যায়, গলিপথে নারীকণ্ঠের কলধ্বনি শোনা যায়।

অবনী শক্ত হয়ে খাটের উপর বসে।

গামছায় বাঁধা ছোট্ট পুঁটলী হাতে ঝুলিয়ে মায়া এসে দরজার সুমুখে দাঁড়ায়। অবনীকে দেখে ওর মুখ কালো হয়ে যায়। চকিতে ওর দৃষ্টি ঘুরে আসে সমস্ত ঘরের মাঝে।

—কাকে কাল ঘরে তুলেছিলি? অবনীর রূঢ় প্রশ্ন ধ্বনিত হয়।

চম্‌কে যায় মায়া। মুহূর্ত্তে সে সাম্‌লে নেয় নিজকে। মুখে হাসি টেনে বলে, মলিনার ঘরে কালকে যায়গা ছিলনা। কয়েক ঘণ্টার জন্য দু'জন শাঁসালো বাবু নিয়ে সে বসেছিল আমার ঘরে। ওকে বলছি,—এখনই এসে ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছে।

এ নির্লজ্জ মিথ্যায় ফেটে পড়ে অবনী।

—সারারাত তুই একা ছিলি? আবার মিছে কথা বলা হচ্ছে, বাজারে মাগী কোথাকার—

ক্ষণিকের তরে থম্‌কে যায় মায়া। পরক্ষণেই কাঁকলি দেয় তার জিব:

—বিয়ে করা মাগ পেয়েছিস্ যে ঘরে পুরে রাখবি। অত সখ ত' রাঁঢ়ের বাড়ী আসা কেন? বেরিয়ে যা ঘর থেকে মুখপোড়া!

সাম্‌লাতে পারেনা অবনী। গর্জ্জন করে তার কণ্ঠ: শালী! অত টাকা খেয়ে এখন মুখ মুছলেই আমি অত সহজে ছাড়ব ভেবেছিস্…

—কি করবি তুই? আমার খুশী ঘরে মানুষ তুলব, মদে ভাসিয়ে দোব মেঝে, মাংসের পাহাড় তুলব ঘরের কোনে।

আস্ফালন করে মায়া।

অবনী বিছানার উপর থেকে পরিত্যক্ত মদের বোতলটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় মায়ার দেহ লক্ষ্য করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দেয়ালে লেগে সশব্দে চুর চুর হয়ে যায় বোতল।

মাযার তীক্ষ্ণ চিৎকারে পাড়া সচকিত হয়ে ওঠে। লোকজন এসে পড়ে।

শাসিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় অবনী।

মাযার সাথে ঝগড়া করে এসে অবনী কিছুতেই মনকে শক্ত করতে পারেনা। যৌবনের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে কেমন যেন একটা কাঙ্গালী-পনা ওকে পেয়ে বসেছে। জীবনে কত নারী এসেছে, কত নারী গিযেছে, এমন ত সে কখনও অনুভব করেনি।

অস্থির মনে বিছানায় ছট্‌ফট্ করে অবনী!

আকাশে ঝক্‌ঝকে তারা মিটি মিটি হাসে। দূরের একটা ঘরে শিশুর কান্না থেমে থেমে সুর করে চলেছে। বস্তিবাসীর ফেলা খাবার খেযে শান্ত হয়ে একটা ঘেয়ো কুকুর বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

অবনী শোনে ঝিঁঝিঁর গান, শোনে পেটা ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্বনি। চিন্তা করে মায়ার কথা। কল্পনায় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে ছুটি মধুর চোখ, পূর্ণ বিকশিত দেহসৌষ্টব, ভেসে ওঠে কত দিনের কত মধুর স্মৃতি।

বার বার ইচ্ছা হয় সব ভুলে গিয়ে মায়াকে বুকে তুলে নেবার। পরক্ষণেই একটা ক্ষোভ ছড়িযে পড়ে মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

নিস্তব্ধ রাত এগিয়ে চলে, একটু একটু করে পরিশ্রান্ত অশান্তি শান্ত হয়ে আসে। মায়ার উপর ক্রোধটা অনেক ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

পরদিন সন্ধ্যার পর আর থাকতে পারেনা অবনী, একটা চকচকে রঙ্গীন শাড়ী কিনে নেয় মায়ার জন্য।

মায়ার দরজার কাছে এসে অর্গলবদ্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে সে চমকে যায়।

তক্তপোষের উপর একজন বাবুর কোলে বসে মায়া অনর্গল বকে চলেছে। সুমুখে মদের বোতল ও গ্লাস।

ক্রোধে পাগল অবনী। প্রচণ্ড পদাঘাতে জীর্ণ দরজা খুলে যায়।

বাবুর কোল থেকে ভীতত্রস্ত পদক্ষেপে নেবে আসে মায়া। অবনী ততক্ষণে মায়ার চুলের গোছা মুঠিতে ধরে ঘা কয়েক বসিয়ে দিয়েছে।

হৈ চৈ ও গোলমালের ভেতর পথ করে অবনী বেরিয়ে আসে রাস্তায়।

অবনী চলে যেতেই মায়া দেখে, কবি ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছে থর থর করে। কৌতূহলী বস্তিবাসীর দলটিকে বিদেয় করে মায়া দরজা বন্ধ করে দেয়।

—ওকি, কাঁপছ কেন? এ সব লাইনে এমন হয়েই থাকে। যাক্, আপদ বিদেয় হ'ল। মায়া তক্তপোষের নীচ থেকে আরেকটা মদের বোতল টেনে বের করে।

কবি বিছানার উপর ধপ্ করে বসে পড়ে। পর পর কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে বলে, যে হাড়-কাঠ গোঁয়ার তোমার রক্ষক। কখন ছুরি মেরে বসবে তার ঠিক নেই, আজকেই নমস্কার দিয়ে যাচ্ছি।

—মানে! তোমার জন্য এত করলুম, এখন ত বলবেই, এইত তোমাদের স্বভাব।

—তাইবলে অপঘাতে মরতে বোলছ? কবি ইতস্ততঃ করে।

—বেশ, এখানে আসতে ভয় পেলে অন্য কোথাও নিয়ে চলো আমাকে।

—কিন্তু...

—আবার কিন্তু কেন? মায়ার ললাটে কুঞ্চন দেখা দেয়।

—মানে...এই রোজগার ত আমার তেমন নয়, তাই সাহস পাইনে।

—এই কথা! তা দু'চারটে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসতে পারবে না?

—সে পারবো। কবি যেন কৃতার্থ হয়ে যায়।

—তা'হলেই হোল। আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না, শুধু দু'বেলা গান-কবিতা শোনাবে কেমন? এখন এইটুকু টেনে নাও। অর্দ্ধেক ভরে মায়া এগিয়ে দেয় একটা মদের গ্লাস।

কবির কালো আঁখিতে দুনিয়া লাল হয়ে যায়।

বহু খোঁজাখোজি করে মায়াকে নিয়ে কবি উঠে আসে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর একটি ফ্ল্যাট বাড়ীতে।

দু'খানা ঘর, বাথরুম এবং সুমুখে ঝোলান বারান্দা নিয়ে ওদের নতুন ডেরা। সখ করে রাস্তার ধারে জানালায় পেতলের খাঁচায় হীরামন পাখী ঝুলিয়ে দেয় মায়া।

খরচ চালাবার জন্য পুরোনো এক সম্পাদক বন্ধু এনে জুটিয়েছে কবি। সময় অসময়ে মায়াকে নিয়ে মশগুল হয়ে ওঠে দুই বন্ধু। মায়ার দেহটা যেন দুই সেতারীর হাতে পড়া একখানা সেতার।

সেদিন কবির সাথে মায়া গিয়েছিল সিনেমা দেখতে। নায়িকার প্রাণস্পর্শী অভিনয়ে মুগ্ধ হয় সে।

কবি শোনায় নায়িকার জীবনের ইতিহাস। অভিনয়ের দৌলতে সামান্য বস্তির বারবণিতা থেকে আজ সে সহরের শ্রেষ্ঠা সুখী মহিলা। ধন ও জন তার হাতের মুঠিতে। বর্ণশ্রেষ্ঠ অভিজাত গৃহের সে কুলবধূ।

শুনতে শুনতে আশায় মায়ার চোখ জল জল করে। বলে, তোমার ত কত জানাশোনা, আমাকে ঢুকিয়ে দাওনা কোথাও।

কবি মাথা নাড়ে।

—না...না...তুমি চেষ্টা করলেই পারবে। উত্তেজনায় মায়া চেপে ধরে কবির হাত।

মায়ার উষ্ণ নরম দু'হাত কোলের উপর টেনে কবি বলে, সিনেমায় সেদিন আর নেই। ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়েরা সব পোকার মত ছেঁকে ধরেছে এপথ। অল্প টাকায় আনকোরা নতুন—ডিরেক্টাররা ত বোকা নয়।

মায়া চুপ করে থাকে। কিন্তু মন প্রবোধ মানে না। অভিনেত্রীর মত সে কি কিছুই পেতে পারে না?

আশে পাশের বাড়ীগুলির দিকে চেয়ে ওর চোখ জ্বালা করে। স্বামী ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে দুঃখে গড়া কি সুন্দর ওদের সংসার। রান্নাবান্না ও ছেলেপেলে মানুষ করা, ঘোমটা দিয়ে আদেশ পালন করা। এক-গাদা মানুষের মন জুগিয়ে চলা, যত কষ্টই হউক না কেন—তবুও ওরা সুখী। আপদে বিপদে ওরা নিশ্চিন্ত, ওদের জন্য ভাববার লোক আছে। দুঃখে আছে সান্ত্বনা, বার্দ্ধক্যে আছে অবলম্বন। সে তুলনায় নিজের ওর কি আছে? কিবা থাকবে?

কবিকে মায়ার ভাল লাগে। কিন্তু ওর সামর্থ্য কোথায় ঘর বাঁধবার। গান গান করেই লোকটা পাগল, ঘরের চেয়ে বাইরের দিকে তার

নজর। আপন পরিজন ফেলে মায়ার কাছে রয়েছে একটা খেয়ালের তাড়ায়...দেহের প্রয়োজনে। কবে আবার কোনদিকে রওনা দেবে কে জানে?

সম্পাদকের কথা মনে হয়। যদিও লোকটা বয়সে বুড়ো—কিন্তু বাঁধুনে শক্ত। কবির চেয়ে অনেক নির্ভরশীল। সে কি রাজী হবে সব ফেলে একটা বারবণিতার ঘরের ঘরামী সাজতে?

দোদুল দোলায় মনের বাসনা মনেই গুমরিয়ে চলে।

সমস্ত দিন অসহ গুমটের পর সন্ধ্যার পর থেকে বইছে মধুর হাওয়া, রাত দশটার পর একাকী থাকবে মায়া। খবর পাঠিয়েছে যাবার জন্য, অফিসে বসে ছটফট করে সম্পাদক।

সমস্ত অফিস আজ চঞ্চল। ভারতের এক মহীয়সী মহিলা মৃত্যু শয্যায়। যে কোন সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন। কাগজ ও কলম নিয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছে সম্পাদক। মৃত্যু-সংবাদ এলেই লিখতে হবে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। ফোনের পর ফোনের উত্তর দিযে হাঁপিয়ে যায় টেলিফোন কর্ম্মচারী। ওদিকে মৃত্যু-পথযাত্রিনীর একই অবস্থা।

অস্থিরতায় ছটফট করে সম্পাদক। মায়ার সঙ্গ পিপাসায় শুকিয়ে ওঠে মনের রুদ্ধমুখ।

রাত এগিয়ে চলে, খবরের ব্যতিক্রম নেই। অস্থির সম্পাদক উঠে দাঁড়ায়। চাদরখানা কাঁধে ফেলে খাস্-বেয়ারাকে একান্তে ডেকে ফিস্

ফিস্ করে বলে, বিনোদ! আমি চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর বাড়ী যাচ্ছি। যদি খবর এসে পড়ে তুই বাইকে চেপে চলে যাবি।

বিনোদ দাঁত বের করে মাথা নীচু করে সম্মতি জানায়।

অন্ধকারের বুক চিরে সম্পাদকের ছোট অষ্টিনখানা দ্রুতগতিতে চলে যায়।

ইংলিশ খাটের নরম গদিতে মায়া ঘুমিয়ে আছে কুঁকড়ে। মৃদু আলো মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে ঘরের মাঝে।

সম্পাদক ঝাঁপিয়ে পড়ে খাটের উপর। মায়ার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

—এত রাত্ত করে ?

—অফিসে বড্ড কাজ ছিল—

কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে মায়া বলে, খবরদার, বলে দিচ্ছি। রাত দুপুরে এসে অফিসের দোহাই আর কখন দেবেনা। ভয়ঙ্কর রাগ ধরে যায়। তারপর সোহাগে সম্পাদকের কানদুটা মুঠো করে ধরে একটা মোচড় দিয়ে দেয়।

চল্লিশ বছর পর কানমলার স্বাদ পেয়ে সম্পাদক চম্‌কে ওঠে। কিন্তু মায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে সব একাকার হয়ে যায়। ঘণ্টা দুই পরে বিনোদ এসে হাজির।

নেশার ঘোরে কর্ত্তা তখন খাবি খাচ্ছে মেঝের উপর। ঠেলে তুলে মায়া তাকে বসিয়ে দেয় একটা চেয়ারের উপর।

বিনোদ জানায়, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মৃত্যু-পথযাত্রিনী, মেসিনে তুলে দিয়েছে ফর্ম্মা। সত্বর চলে আসুন।

দাঁড়াতে গিয়ে টলে পড়ে যায় সম্পাদক। বিহ্বল দৃষ্টিতে মায়ার

মুখের দিকে চেয়ে জড়িত কণ্ঠে চিঁ চিঁ করে, কি করা যায় মায়া! এ অবস্থায় অফিসে যাওয়া অসম্ভব। অথচ প্রবন্ধ না লিখে দিলে যে কাল মুখ দেখাবার জো থাকবে না।

—বিনোদকে অপেক্ষা করতে বলে যা হয় এখান থেকেই লিখে দাও। নিস্পৃহ কণ্ঠে মায়া উত্তর দেয়।

—সব যে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সম্পাদক শূন্যে দু'হাত মেলে কি যেন খোঁজে।

—গলায় আঙুল দিয়ে কিছু বের করে নাও। একটু ধাতস্থ হবে...

বারান্দায় চোখ বুজে বসে আছে বিনোদ। মাঝে মাঝে ভেতর পানে উঁকি দিয়ে নিঃশব্দে সে হাসে তার হল্‌দে দাঁত বের করে।

কাগজ কলম এগিয়ে দেয় মায়া। কলম হাতে সম্পাদক ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চারপাশে তাকায়।

—কি লিখবো? খেঁই যে ধরতে পাচ্ছিনে।

—আরম্ভ করো একটা কিছু দাঁড়াবেই।

—আরম্ভ করব এ্যাঃ—তাই না...

সম্পাদক ঝুঁকে পড়ে কলমের উপর। অক্ষরের মালা গেঁথে চলে কাগজের বুকে।

লেখা শেষ হতেই মায়া তুলে নেয় কাগজগুলি। ভাল করে ভাঁজ করে বিনোদের হাতে দিয়ে বলে, তোর কর্ত্তার পেয়ারের কোন বাবু নেই অফিসে?

—সে আছে বই কি দিদিমনি। অক্ষয়বাবু যে তেনার খুব খাতিরের লোক। পিট্‌ পিট্‌ করে মায়ার দিকে তাকিয়ে বিনোদ উত্তর দেয়।

—তা'হলে তাকে বাবুর অবস্থাটা বলবি। এ কাগজখানা তাকে দেখাবি। অদল বদল করার দরকার হলে যেন তিনিই করে দেন।

বিনোদ কাগজ নিয়ে ছোটে অফিসমুখো।

প্রভাতে পাঠককুল মুগ্ধ হয় সম্পাদকীয় রচনার দরদঢালা লেখন-ভঙ্গীতে।...সত্যই জাতি যেন আজ মাতৃহারা...

৭

গুণ্ডার লাঠিবাজীর বিরুদ্ধে হয় না কোন প্রতিবাদ কিংবা মালিকের জুলুমের হয় না কোন প্রতিবিধান। বর্ষাভেজা ঘরে ভিজে মরে অবজ্ঞাত মানুষের দল।

ষ্ট্রাইক ব্যর্থ হয়ে যাবার পর থেকে যোগেশ অদ্ভুত রকম গম্ভীর হয়ে পড়েছে। অন্তরঙ্গ কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে কি যেন শলা-পরামর্শ করে।

কারখানার দরজায় প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের হাতের বন্দুকের কালো নল রদ্দুরে চিক্ চিক্ করে।

রবির সাথে কথাবার্ত্তা একদম বন্ধ করে দিয়েছে অবনী। তার চোখে দেখা যায় প্রতিহিংসার স্ফুলিঙ্গ।

চারিদিকে একটা থম্‌থমে ভাব।

রবি ভীত হয় মনের মাঝে। কখন...কিভাবে...কি অবস্থায়...কি হবে...কে জানে?

কিন্তু রবির ভীতত্রস্ত ভাব কেটে যায় ঘরে ফিরে এলে। আজকাল নানা রূপ ও রসে মিনুকে ঘিরে রবির কল্পনা হয় মূর্ত্ত। একাকী জীবনে অন্য একটি জীবন জড়িয়ে রবি আনন্দিত। নতুন জীবনের আস্বাদনে তৃপ্ত মন নিয়ে কয়েকদিন যাবৎ ওভার টাইম খাটা আরম্ভ করেছে সে।

দোকানে একটা নতুন শাড়ী দেখলে ইচ্ছা হয় কিনে নেবার। সিনেমা হাউসের দেয়ালে আঁকা লোভাতুর সুন্দর ছবিগুলি দেখে ইচ্ছা হয় মিনুকে নিয়ে গিয়ে দেখে আসতে। ইচ্ছা হয় বাবুদের মত বউ পাশে নিয়ে রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে।

বড্ড লাজুক মিনু, ঘর ছেড়ে একদম বেরোতে চায় না। বেশী জোর করলে মুখ ভার করে। রবি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। সহুরে মেয়ের অত লজ্জা দেখে এক এক সময় ওর মনের মাঝে রাগ হয়। কিন্তু মিনুর ছোট্ট সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সে রাগ জল হয়ে যায়। কি যে যাদু ঐ একটুখানি মুখে রবি ভেবে কূল পায় না।

পত্রিকা পড়তে পারে না বলে রবির বড় দুঃখ। যোগেশের হাত থেকে পত্রিকা নিয়ে কেবল সে ছবিই দেখে। যোগেশ যখন দেশ-বিদেশের খবর পড়ে শোনায়, রবির মন তখন আকুলি বিকুলি করে। বড় ইচ্ছা হয় ওর লেখা-পড়া শিখতে।

সম্প্রতি কিছুদিন ধরে একটা নতুন চিন্তা ওকে ভাবিয়ে তুলেছে। মূর্খ বাপ সে কিছুতেই হতে পারবে না।

একদিন সে একখানা বর্ণমালা কিনে নিয়ে আসে। ওর মোটা বিকৃত কণ্ঠের অ-আ-ক-খ উচ্চারণে ঘর ভরে যায়। কৌতুকে মিনু বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে। রবি মনে মনে রাগে—আরও জোর গলায় চিৎকার করে পড়ে।

মালপো খেতে ভালবাসে রবি, একটা গামলায় আটা ও ভেলীগুড় জল দিয়ে মেখে নিয়েছে মিনু। তেলে ভেজে মোটা মোটা মালপো সাজিয়ে রাখছে থালার উপর।

রান্নাঘরের মেঝেতে বসে রবি গুনগুনিয়ে ধরেছে গান। নিজ স্ত্রীর হাতের মালপো!—মনে করেই আনন্দ চেপে রাখতে পারে না সে। গানের ফাঁকে ফাঁকে থালা থেকে মালপো তুলে মুখে দেয়।

মিনুর থালার একটা কোন কিছুতেই ভরে না। রবি ফের একটা মালপো তুলতেই মিনু ধম্‌কে ওঠে।

রবি মিনুকে চটাবার জন্য ওর প্রকাণ্ড খোঁপাটা খুলে দেয়।

চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়ে ঢেকে দেয় মিনুর মুখ চোখ।

চটে যায় মিনু। সশব্দে কড়াটা নাবিয়ে বলে, এমনি করলে মানুষ পারে? পড়ে রইলো তোমার রান্নাবান্না, আমি চল্লুম—

—এই...এই...হচ্ছে কি! আমি একলা খাচ্ছি বলে তোমার রাগ হচ্ছে। এ্যাঃ...বেশ এটা তুমি খেয়ে নাও।

মিনু গোঁজ হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।—ছাড়ো হাত, ব্যথা পাচ্ছি যে...

—এটা আগে খেয়ে নাও।

—ছাড়বে কিনা বল?

—খাবে কিনা বল?

মিনু স্বামীর মুখের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে,—বেশ দাও তোমার মালপো—

হাতে নিয়ে মালপোখানা মুখে দিতে যেতেই রবি হা হা করে চিৎকার করে।

চম্‌কে মিনু প্রশ্ন করে, কি হোল?

—কত বড় হাঁ কচ্ছিলে তখন। হাঃ...হাঃ...হাঃ প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে রবি।

—শুধু শুধু জ্বালাবে আমাকে? মিনু রেগে রবির মুখে মালপোথানা গুঁজে দিয়ে হেসে ফেলে।

সেদিন সমস্ত রাত হয়েছে বৃষ্টি। রাতের শেষেও আকাশের বর্ষণ হয়নি শেষ। ঝির ঝির করে ঝরছে জলধারা, তারই মাঝে লাইন দিয়ে শ্রমিকরা ঢুকছে কারখানায়।

মাথায় একটা বস্তা চাপিয়ে রবি লাইনের শেষ দিকে দাঁড়িয়েছিল।

জলে ভিজে শীর্ণদেহা একটি মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক এসে রবির পাশে দাঁড়ায়। চিনতে অসুবিধে হয় না রবির। কাল পটারীর ধারে বস্তিতে যক্ষ্মাক্রান্তা স্বামীর শয্যাপাশে একে দেখে এসেছিল সে।

—তোমার সাথে একটু দরকার ছিল ভাই। রবির দিকে কাতর দুটি চোখ তুলে স্ত্রীলোকটি বলে।

—আমাকে? রবি লাইন থেকে বেরিয়ে আসে।

অনুচ্চ কণ্ঠে স্ত্রীলোকটি বলে, তুমি চলে আসার পর ওর কেমন জানি হয়েছে। মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, আর থেকে থেকে তোমার কথা বলছে। একটু যাবে—

লাইন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রবি ইতস্ততঃ করে।

—তুমি গেলে সে খুব খুশী হবে। অনুনয়ে স্ত্রীলোকটির কণ্ঠ যেন বুজে যায়।

রবি বলে, তুমি বাড়ী যাও, আমি সাঁঝে গিয়ে দেখা করব।

স্ত্রীলোকটি অলস মন্থর পদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলে যায়।

কাজের ফাঁকে রবি যোগেশকে ব্যাপারটা জানায়। যোগেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুধু বলে, রোগটা ভাল নয়, সাবধানে মেলা-মেশা করো।

ডিউটি শেষে রবি যোগেশদের দলের আশু ডাক্তারকে গিয়ে ধরে।

সব শুনে আশু ডাক্তার বলে, যক্ষাতে শুধু ডাক্তার নিয়ে গিয়ে কি লাভ? রোগ খারাপ হয়ে থাকলে তাকে কোন যক্ষা হাসপাতালে পাঠাতে হবে। তা'ছাড়া এ ব্যায়রামের চিকিৎসা গরীবের পক্ষে অসম্ভব।

—তবু চলুন ডাক্তার বাবু। একবার শুধু রুগীকে নিজ চোখে দেখে আসুন।

—বেশ চলো। ডাক্তারের উদাসী কণ্ঠ উত্তর দেয়।

রুগী দেখে আশু ডাক্তার গম্ভীর হয়ে যায়।

নিবারণ শীর্ণ হাত দিয়ে ডাক্তারের একটা হাত জড়িয়ে ধরে শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে।

—মরতে চাইনে ডাক্তার বাবু। আমাকে বাঁচিয়ে দিন। চির-কালের গোলাম হয়ে থাকব। যতদিন বাঁচব আপনার জুতো বয়ে বেড়াব বাবু।

নিবারণের স্ত্রী আশু ডাক্তারের পা বুকে চেপে চোখের জলে ভিজিয়ে দেয় তার উষ্ণ পশমী মোজা।

নিবারণের আর্তকণ্ঠে রবির চোখ সজল হয়ে ওঠে।

ডাক্তার আশু রায়! বহু জীবনের বহু করুণ দৃশ্যের দ্রষ্টা সে। পা দুটি উষ্ণ জলের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করে সে বলে,

কি করতে হবে, রবিকে সব আমি বলে দোব। ভয় নেই ভাল হয়ে উঠবে।

—ভাল হ'ব ডাক্তার বাবু, সত্যই ভাল হবে ডাক্তার বাবু? একই সাথে প্রশ্ন করে স্বামী-স্ত্রী। কান্নায় ভেজা চোখ পল্লবের ফাঁকে দু'জনেরই দেখা যায় আশার ঝিলিক্।

—আমি ত বলছি ভাল হ'বে। বড় ক্ষীণ শুনায় ডাক্তারের কণ্ঠস্বর।

রবিকে নিয়ে ডিস্‌পেন্‌সারিতে ফিরে আসে ডাক্তার।

—একটা ফুসফুস একদম ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। অন্যটিও আক্রান্ত। আশা নেই—দেখো যদি হাসপাতালে ঢোকাতে পারো। আশু ডাক্তার নির্দ্দেশ দেয় রবিকে।

রবি ঘুরে আসে প্রত্যেকটি হাসপাতাল। কোথাও শোনে ভিজিটিং সার্জ্জেনকে মোটা ভিজিট দিয়ে প্রথম একবার ডাকলে পরে হয়ত ব্যবস্থা হতে পারে। কোথাও শোনে বিভাগীয় কর্ত্তাকে বেশ কিছু দেবার ব্যবস্থা করা চাই। সর্ব্বত্রই বলে দেয় একটি সিট্‌ও খালি নেই।

আশু ডাক্তারের অর্থহীন মিক্‌শ্চারই রবি বয়ে দিয়ে আসে নিবারণের ঘরে।

আশান্বিত নিবারণ একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে পাড়ি জমায়।

সুখে দুঃখে আশা ও আনন্দের কল্পনার জাল বুনে দিন এগিয়ে চলে।

নাইট ডিউটির আজ শেষরাত। দম ফুরিয়ে আসা মেসিনের মত ধুঁকে ধুঁকে কাজ করে রবি।

মেসিনের মুখ দিয়ে লাল টক্‌টকে রড অনেকটা বেরিয়ে এসেছে।

নরম লোহার দেহ অবলম্বন না পেয়ে একটু একটু করে বেঁকে যায়। রবি দেখেও দাঁড়িয়ে থাকে. এগিয়ে গিয়ে সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরতে দেহের মাঝ থেকে কোন সমর্থন পায় না।

নরম লোহা বৃত্তের আকার নেবার চেষ্টা করে। রবি শরীরটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে এগিয়ে যায়। বেতন থেকে চার আনা কাটা যেতে দিতে সে পারে না. শিথিল হাতে ভারী সাঁড়াশীতে রডের মুখটা চেপে ধরে। একটু একটু করে টেনে বৃত্তাকার রডকে সোজা করে এনে ঢুকিয়ে দেয় পরবর্ত্তী মেসিনের মুখে।

কারখানার ঘড়িতে রাত দুটো বেজে গিয়েছে। শেডের নীচের আলোগুলি বাষ্পে লাল্‌চে হয়ে উঠেছে। নানা মেসিনের মিলিত নানা শব্দ ঐক্যতান সৃষ্টি করছে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড শব্দ করে ষ্টীম বেরোচ্ছে। অয়েলম্যানরা তেলের ডিবে হাতে নিয়ে ঘুর ঘুর করে মেসিনে তেল দিয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ইন্‌স্পেকটার ঘুরে যায়।

রাত জেগে কাজ করা গা-সহা হয়ে গিয়েছে রবির। ঘুম পায় না সত্য, তবু পরিশ্রান্ত শরীরে কেমন একটা অসহ্য অসোয়াস্তিকর ভার বোধ হয়।

শেডের পাশে নারকেল গাছে কাকের বাসায় কলরব আরম্ভ হয়। দূরে ধাঙ্গর পল্লীর মোরগ সু-উচ্চ কণ্ঠে প্রভাতের আগমনী তান দেয়। একটা বিরহ ব্যথাতুর কোকিল ভোরের জন্য অপেক্ষা সহ্য করতে না পেরে ডেকে ওঠে। বড় বড় নিঃশ্বাস ছেড়ে পরিশ্রান্ত যন্ত্রদানব ছুটির প্রহর গোণে।

কারখানার ঘড়িতে ছ'টা বাজবার দশ মিনিট বাকী। চঞ্চল হয় রাত-জাগা মানুষ কয়টি।

অয়েলম্যানরা শেষবারের মত মেসিনগুলিতে তেল দিয়ে যায়। হেড মিস্ত্রীর হাঁকাহাঁকি আরম্ভ হয়। ছুটির আনন্দে কারখানা ঘরে কলরব আরম্ভ হয়েছে। বিকট শব্দ করে আটকানো ষ্টীম বেরোতে থাকে।

রবি প্রস্তুত হয়। সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে সাইরেন বাজে···ছুটির বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। শেষবারের মত লালমুখো রডটা সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরে টেনে দেয় সে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে মেশিন থেমে যায়। হাতের সাঁড়াশী হেড-মিস্ত্রীর কাছে জমা দিয়ে সে চলে আসে উত্তপ্ত শেড ছেড়ে।

এক ঝলক্ ঠাণ্ডা হাওয়া ওর রাত-জাগা ফোলা ফোলা চোখ ও মুখের উপর লুটিয়ে পড়ে' একটা মধুর প্রলেপ টেনে দেয়।

সুদৃঢ় লোহার ফটকের একপাট খুলে গিয়েছে। বেঁটে বেঁটে নেপালী দরওয়ানগুলি পিট্ পিট করে তাকাচ্ছে। লাইন দিয়ে শ্রমিকরা একে একে বেরোতে থাকে।

'গেটপাশ' পকেটে রেখে রবি বাইরে এসে দাঁড়ায়। সুমুখ দিয়ে একটা মালবাহী মোষের গাড়ী ক্যাচ্ ক্যাচ্ শব্দ করে মন্থরগতিতে এগুচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, বহুদূর থেকে আসছে গাড়ীটা। মোষ দুটোর মুখ ভরে গিয়েছে সাদা ফেনায়। মাথা নীচু করে পিঠ বাঁকিয়ে টেনে চলেছে অপরের পণ্যসম্ভার। নির্ম্মম গাড়ওয়ান ওদের বেরিয়ে পড়া শিরদাঁড়ার উপর লাঠির ঘা দিয়ে তাড়া দিচ্ছে।

রবির মুখের বিড়ি ধরান হয়না ক্ষণেকের তরে। ঐ পরিশ্রান্ত নিষ্পেষিত বোকা পশু দুটার সাথে নিজের সাদৃশ্য খোঁজে সে নানাভাবে। অমিল বড় বেশী পায় না। ছোট ছোট চুলকাটা পালোয়ানী চেহারার

গাড়োয়ানটার সাথে ইন্‌স্পেক্‌টারের মুখের আদলের অনেকটা মিল চোখে পড়ে।

ধীরে ধীরে গাড়ী চলে যায় চোখের সীমার বাইরে। রবি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, এক ফাঁকে মুখের বিড়ি ধরিয়ে নেয়।

ঘরে ফিরে এসে রবি বসে পড়ে সরু দাওয়ার উপর। চালের উপর দিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলিপথ বেয়ে সামান্য হাওয়া এসে লাগে ওর উত্তপ্ত মস্তিষ্কে। হাওয়ার সাথে বয়ে আসে চারপাশের ড্রেনের দুর্গন্ধ। এরই মাঝে খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে বসে সে খোঁজে বিশ্রাম।

এক গ্লাস গুড়ের সরবৎ তৈরী করে নিয়ে আসে মিনু। রবি ওর হাত থেকে গ্লাসটি নিয়ে নিমেষে নিঃশেষ করে ফিরিয়ে দেয়। রাত-জাগা তাতানো শরীরে সরবতের স্নিগ্ধতায় অনেকটা আরাম বোধ হয়।

গ্লাস রেখে ফিরে এসে মিনু রবির পাশে বসে একটা হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে থাকে।

—কাছে এসো লক্ষীটি! রবি মিনুর হাত থেকে পাখা নিয়ে তাকে টানে আরও কাছে।

মিনু স্বামীর মাথার রুক্ষ চুল আঙ্গুল দিয়ে আঁচড়ায়।

—বড্ড ঘুম পেয়েছে, আকাশের দিকে মুখ তুলে রবি হাঁই তোলে।

—স্নান করে ঘুমোয় এসে।

—না—ঘুমিয়ে উঠে পরে স্নান করব। তারপর একপেট খেয়ে আবার ঘুমোব। ভেতরে চলো, একটা কিছু বিছিয়ে দেবে।

রবি মিনুর দেহে ভর করে উঠে দাঁড়ায়।

ঘরের ভেতর মাদুর বিছিয়ে দেয় মিনু। রবি গায়ের নোংরা জামা

খুলে মিনুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে ওর দু'চোখ বুজে আসে উষ্ণ উত্তাপ ও নিশ্চিন্ত আরামে।

মিনু মহা মুস্কিলে পড়ে। এ সপ্তাহে রেশনের বরাদ্দ কিছুটা কমিয়েছে। একদিনের টান পড়েছে চালে। কালোবাজার থেকে চাল কিনে নিয়ে না এলে আজ ভাত খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে। বলি বলি করেও পরিশ্রান্ত মানুষটাকে বলতে সে পারে না চালের জন্য ঘুরে মরতে।

মাথা নীচু করে মিনু তাকায় রবির ঘুমন্ত মুখের দিকে। একটা অনাবিল আনন্দ খেলা করছে তার সারা মুখ জুড়ে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে মিনু চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে ওর নরম হাতখানা রবির কপালের উপর দিয়ে ঘুরে আসে।

এভাবে বসে থাকলে যে তার চলবে না। চাল যোগাড় করে রান্না বসাতে হবে। ঘুম থেকে উঠেই যে রবি খেতে চাইবে।

সযত্নে রবির মাথা সে নামিয়ে রাখে মাদুরের উপর। কিন্তু কোত্থেকে যোগাড় করা যায় চাল! সবাইর ঘরেই যে এক অবস্থা। পদ্মমাঝির কথা মনে হয়। ওর বাড়ীতে দু'জন টাইফয়েডে পড়েছে। তাদের দুজনের চালটা রয়ে যাচ্ছে। সেখানে চাইলে নিশ্চয় কিছু পাওয়া যাবে।

অপরের দু'সময়ের সুযোগ নেবার হীনতায় মিনু অসোয়াস্তি বোধ করে। কিন্তু এ ছাড়া যে উপায় নেই।

রবিকে নিয়ে সংসার চালাতে হিমসিম্ খেয়ে যায় মিনু। রবির পরোপকারের প্রবৃত্তিটাকে একটু কমাতে পার্লে যেন সে বাঁচে।

ছেলের বাপ হয়েও হুঁশ হ'লনা মানুষটার। পরিশ্রম সে করছে যথেষ্ট, রোজগারও করছে একরকম। কিন্তু হপ্তার প্রাপ্য টাকা থেকে কিছুটা দান-খয়রাৎ করে সে আসবেই। বেশী কিছু বল্লে মিটি মিটি হাসে। মিনু চটে যায়। শক্ত শক্ত কথা বলে রবিকে। কখন অতিষ্ঠ হয়ে রবি ঘর থেকে বেরিয়ে ঘুরে আসে বাইরে। কখন বা অসীম ধৈর্য্যের সাথে বসে মিনুর কথা শুনে যায় নিঃশব্দে। আবার কখন বক্তৃতা আরম্ভ ক'রে ভাসিয়ে দেয় মিনুর ক্রোধ।

কত বড় বড় আশার কথা সে শোনায়। ধনী-গরীবের বিভেদ মুছে যাবার আর দেরী নেই। দুঃখের পরই আসবে সুখ। ক'টা দিন মাত্র কষ্ট করতে হবে। তারপর আর মেহনতি মানুষের থাকবে না ভাবনা। নন্তকে কোলের উপর নাচিয়ে নিয়ে বলে, ওর ভাবনা ভাববে সরকার—ওর ভাবনা ভাববে দেশ। স্বর্ণময় যুগের ওরা যে বুল্‌বুল্।

মিনু রবির কল্পনাদৃপ্ত মুখের দিকে চেয়ে বকুনি ভুলে যায়।

কিছুদিন বেশ চলে সংসার-তরণী।

শীত পড়েছে প্রচণ্ড। সেদিন ডিউটি থেকে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল রবি।

—ও—কি! চাদর কোথায়? মিনু স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

—নাথুনু ঠাণ্ডায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল। ব্যায়রামি মানুষ, শীত সহ্য

করতে পাচ্ছিল না। চাদরটা তাই দিয়ে এলুম।

—এখন নিজের ব্যবস্থা হবে কি ?

—ছেঁড়া ধুতিটা দু'ভাঁজ করে গায়ে দিলেই চলে যাবে।

মিনু চটে যায়। কিন্তু রবির স্নিগ্ধ প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে পারে না।

আর একদিন ডিউটি থেকে ফিরে এল রবি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে।

কোথাকার কোন কোম্পেনীর ধর্ম্মঘটী শ্রমিকরা জয়লাভ করেছে। মালিক মেনে নিয়েছে তাদের দাবী-দাওয়া।

—বুঝ্‌লে মিনু! এসব হচ্ছে জয়যাত্রার সূচনা। মালিকের মাতব্বরি বেরোল বলে। যোগেশদাদের খবরটা দিলুম; ওরা খুশী হ'ল না মোটেই। এসব আমার ভাল লাগে না। একই দলের নাইবা হ'ল, তবু ত শ্রমিকদের জয়। শ্রমিকদের জয় মানেই ত আমাদের জয়।

মিনু এত সব বোঝেনা। ছেলের শরীর দু'দিন যাবৎ জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। সেই চিন্তাতেই সে অস্থির।

—ওসব রাখো এখন। চট্‌পট্ দুটি খেয়ে ডাক্তারের বাড়ী যাও। নন্তুর জ্বর একদম কমেনি।

—জ্বর কমেনি ?—এ্যাঃ! রবি ব্যস্ত হয়ে পড়ে।···

এরও কয়েকদিন পরের এক দুপুর বেলায়, মিনু ছিলনা ঘরে। রবি চারিদিকে তাকিয়ে তাকের উপর থেকে নন্তুর বার্লির কৌটো নামিয়ে দ্রুতহাতে একটা কাগজে বার্লি ঢেলে নেয়।

—কি হচ্ছে ? মিনু এসে ঘরে ঢোকে।

ধরা পড়ে রবি থতমত খেয়ে যায়।

মিনু এগিয়ে এসে কাগজের দিকে চেয়ে রেগে যায়, কিন্তু রবির কাচুমাচু মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে।

—অতগুলি বার্লি ঢেলে নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছিল ? বলি, হপ্তার প্রথমেই যদি বার্লি ফুরিয়ে যায়, কি করে ব্যবস্থা হবে ?

—মন্নুর বৌটা জ্বরে ভুগছে। ওকে এ বার্লিটুকু দিচ্ছিলাম। এক-গাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে যা অবস্থায় পড়েছে, নিজ চোখে দেখলে তুমিও দিতে।

অবুঝ লোকটা বুঝতে চায়না নিজের অবস্থা। এমন করে ব'লে ব'লে কত আর পারা যায়। স্নিগ্ধ ব্যথিত গর্ব্বভরা দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় মিনু।

রবি বার্লির মোড়কটা পকেটে ভরে। দরজার দিকে চেয়ে দেখে নিয়ে নন্তুর জন্য আনা দুটো পাতিনেবু থেকে একটা নেবু কোঁচড়ে গুঁজে বেরিয়ে আসে রাস্তায়।

৮

একাকী গ্রাস করার আনন্দ-কল্পনায় সম্পাদক রাজী হয়েছে মায়ার প্রস্তাবে। পুরোনো ফ্ল্যাট্ ছেড়ে ওরা উঠে যায় অন্য একটা বাসায়।

স্বপ্ন দেখে মায়া। ওব কল্পনাব অস্পষ্টতা চায় স্পষ্ট হতে। মদ স্পর্শ করেনা সে। কপালে ও সিঁথিতে দেয় মোটা করে সিঁদুর।

আশেপাশের বউ ঝিয়ারিবা আসে। করে নানা গল্প, ইঙ্গিত করে স্বামীর বয়স নিয়ে, করে তার মাতলামোর নিন্দা।

অধিকাংশ সময় মায়া চুপ কবে থাকে। এদের সাথে কথা বলতে ওর একটু ভয় করে। তা'ছাড়া মাতাল বুড়োটা যে মদ ছেড়ে চলতে পারেনা, এর সে কি কববে? কতটা জোরই বা খাটাতে পারে তার উপব।

সম্পাদক হাসে মায়ার অভিনয় দেখে। ওর দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সে তৃপ্ত। কায়মনে প্রার্থনা করে, মায়ার এ ঘরমুখো ব্যাযরাম সমান তেজে জ্বলুক ওর অন্তরে।

যতই দিন কাটতে থাকে ততই একটা অবসাদবোধ করছে মাযা। কোন নূতনত্বই সে পায়না এ জীবন থেকে।

এক একবার ইচ্ছা হয় পুরোণো জীবনে ফিরে গিয়ে উদ্দামতার মাঝে গা ভাসিয়ে দিতে। কিন্তু একটা আশা, একটা সস্নেহ ভালবাসার কাঙালীপনা ওকে পিছু টেনে রাখে।

সম্পাদকের ভালবাসার নগ্নতা ওর চোখে ধরা পড়েছে। সেই একই

কামনার জ্বালা…দেহের প্রয়োজন…উদ্দামতা ও প্রলাপ কিন্তু কোথায় সে পাবে…কার কাছে যাবে…কে দেবে পোড়া বুকের মাঝে একটু ঠাণ্ডা প্রলেপ ?

রাস্তার উল্টোদিকে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে একটা মেসবাড়ী। এক একটি ঘরে নানা বয়সের নানা মাপের দু'তিনটি করে লোকের বাস।

বরাবর ঘরটায় একটা লোক দেখে বড় অদ্ভুত লাগে মায়ার। শনিবার সমস্ত মেস খালি হয়ে যায়, লোকটা পড়ে থাকে ঘরের কোনে। অফিস এবং মেস্ নিয়েই যেন তার জীবন। প্রথম প্রথম মায়াকে দেখে সে সরে যেত। যতই দিন যাচ্ছে হ্যাংলার মত হয়ে যাচ্ছে মানুষটা। সময় অসময়ে চোরের মত তাকিয়ে থাকে মায়ার ঘরের দিকে।

বোধহয় তিনকুলে কেউ নেই। মায়া সমবেদনা বোধ করে। যৌবন এখনও পেরিয়ে যায়নি, অথচ উপোষী মানুষের ছাপ ওর মুখের উপর স্পষ্ট।

মায়ার মাথায় একটা চিন্তা এসে জাগে। ঘরহারা এ কাঙালীকে নিয়ে ঘর বাঁধলে…ওর চারপাশ ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রাখলে—
….সে পাওয়ার মাঝেই ওর চাওয়ার চাহিদা ডুবে কি যাবে না ?

চেষ্টা করে মায়া, বুঝতে চায় লোকটাকে। কিন্তু অবাক হয় তার ভাবভঙ্গিতে। দুর্বোধ এলোমেলো একটা আবরণ দিয়ে তার চারপাশে

ঘেরা। এক একবার কিছুটা এগিয়ে এসে তার চেয়েও অনেক বেশী পিছিয়ে যায় মানুষটি। কুলবধূ মায়া সব দিক বাঁচিয়ে কি করতে পারে?

*　　　*　　　*

নিজের সাথে যুদ্ধ করে করে আর কতদিন পারা যায়। মৃগাঙ্ক বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। ঐ টুকটুকে বউটিকে দেখে, তাকে পাওয়ার জন্য ওর সমস্ত সত্বা উন্মুখ। মাতাল বুড়োর হাতে পড়ে বউটির সুখ নেই। ওর মনের কথা কি আর অজানা মৃগাঙ্কের কাছে। তবু সে এগিয়ে যেতে পারেনা।

অফিস থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে মৃগাঙ্ক এগিয়ে যায় কার্জ্জন পার্কের একটা নিরিবিলি কোনের দিকে। পকেটে খস্ খস্ করে বেতন পাওয়া নোট কয়টি।

সরকারী অফিসের দেড়শো টাকা বেতনের কেরাণী হচ্ছে মৃগাঙ্ক রায়। দেশের বাড়ীতে থাকে তার একগাদা ভাইবোন ও বুড়ো বিধবা মা। বেতন পেয়ে অধিকাংশ টাকাই পাঠাতে হয় সেখানে। পনেরটি বছর যাবৎ বৈচিত্র্যহীনভাবে মহানগরীর জীবন তার চলেছে কাজের জোয়াল বয়ে। আশা ও আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও কামনা এবং আবেগের স্পন্দন হয়ে এসেছে ফিঁকে। বসন্ত চলে যায় চোরের মত। কোকিলের ডাক যায়না কানে। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগ ও অকাল চলে হাত ধরাধরি করে। বিদেশী শাসন নিয়েছে বিদায়, দেশ হয়েছে স্বাধীন। কিন্তু ওর জীবনে আসেনি কোন রূপান্তর, সিঁড়ি কোঠার সেই

কোনেই রয়েছে তার সিট্। পনের বছর আগে যে যায়গায় সে ঢুকেছিল কাজে, আজও সেখানেই আছে অনড় হয়ে।

জীবনে যে সবাই সব কিছু পায় তা নয়। বর্ত্তমান ওর ধূলিতে ভরা, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কিন্তু অতীতের জীবন-পাতা হাঁত্ড়ে দেখলে কিছু পাওয়া যায় বই কি!

ডিগ্রীর পরীক্ষার বছরের নিরস দিনগুলি ছিল তার একটি মেয়ের ভালবাসায় ভরা। বাপ ছিল মাথার উপর, ভাবনা ছিল না মনে।

বেঞ্চের উপর নড়ে বসে মৃগাঙ্ক, চশমার পুরু কাচ ঘসে কাপড়ের খুঁট দিয়ে। একটা উত্তপ্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে ধীরে ধীরে।

পার্কের মাঝে নিরবতা এসেছে নেমে। কর্মক্লান্ত বিশ্রামীরা অনেকেই উঠে গিয়েছে। বেশভূষায় পরিপাটি নতুন নতুন লোকেরা এসে বসেছে।

উগ্র সেণ্টের গন্ধ ছড়িয়ে একজোড়া নর ও নারী হাতে হাত রেখে চলে যায় সুমুখ দিয়ে। নারীর আঁচলের জরির ফুলগুলি গ্যাসের আলোতে জ্বলে যেন ধ্বক্ ধ্বক্ করে।

বহুদিন বাদে ছন্দার স্মৃতি মনটা নাড়া দেয় সজোরে। যদিও ছন্দা আজ পর-স্ত্রী, তবুও ভাবতে ভাল লাগে তাকে।

থার্ডইয়ারে পড়বার সময় কলেজের এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে তার বোন মধুছন্দার সাথে আলাপ হয়েছিল মৃগাঙ্কের। ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে ওদের ঘনিষ্ঠতা। ভবিষ্যতের কল্পনায় দু'জনেরই মন থাকত রাঙা হয়ে। পরীক্ষায় ভালভাবেই পাশ করে মৃগাঙ্ক। ছন্দা হয়ে ওঠে আশান্বিত। কিন্তু হঠাৎ বাপ মারা গিয়ে সব উল্টে দেয়। সংসার অচল, কাজের জন্য ঘুরে মরে মৃগাঙ্ক। বহুকষ্টে সে জুটিয়ে নেয় এ কাজটি।

বছর ঘুরে আসে। এক নিবিড় সন্ধ্যায় ছন্দা প্রস্তাব করে ঘর বাঁধবার। ছোট একটি ঘর হলেই তার চলবে। দখিনদিক খোলা হলে আরও ভাল। জানালার গরাদে কেঁয়াফুলের শিষ্ ঝুলিয়ে রাখতে হবে। সুগন্ধে ভরে থাকবে ঘরের বাতাস। ঘরের মাঝে বেশী জিনিষ-পত্তর রাখা চলবে না কিন্তু—

ছন্দা বলেছিল আরও অনেক, প্রকাশ করেছিল তার স্বপ্নময় কল্পনা নানাভাষায় ও নানাছন্দে: কিন্তু পিছিয়ে এসেছিল মৃগাঙ্ক। ভাই-বোনদের হুমুঠি ভাত জুগিয়ে দিতেই যে হিম্‌সিম্ খেয়ে যায়, তার কবিত্ব করা চলতে পারে না। এক একবার ইচ্ছা হ'ত সব অস্বীকার করে ছন্দাকে বিয়ে করে মনের হুনিবার আকাঙ্ক্ষাকে মুক্তি দেবার। পর-মুহূর্ত্তেই ছন্দার সুন্দর মুখখানির পাশে বৃদ্ধা মার রেখাবহুল করুণ মুখ ও ছোট ছোট ভাইবোনদের শুষ্ক মুখগুলি ভেসে উঠে ধিক্কার দিত।

সত্যই অন্যায় করেছিল সে ছন্দাকে প্রলুব্ধ করে। মৃগাঙ্ক মাথা নাড়ে।

সময় কেটে যায়। পার্কের ভিড় কমে এসেছে। ছোট ছোট ঝোপের মাঝে ঝিঁ ঝিঁর ডাক চলেছে জোরে।

চিবুক নেমে এসেছিল বুকের উপর। মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়ায়। তার জীবন ত এতো অন্ধকার, এতো নীরস, এতো ফাঁকা নয়। ছোট ছোট ভাইবোনদের সস্নেহ ভালবাসা যে রয়েছে চারপাশ ঘিরে, তবু কেন এ আকুলতা ?

উঠে দাঁড়ায় মৃগাঙ্ক। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সে এগিয়ে যায়।

  

রাত্তির একটা, মৃগাঙ্ক বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করে। কিছুতেই সে ঘুমোতে পারে না। অবশেষে উঠে আসে ছাদে, কার্নিশে ভর করে তাকায় দূরের একটা সবুজ আলোর দিকে। আকাশের তারা ও চাঁদ, নগরীর আলোর মালা; সব ছাপিয়ে ঐ স্নিগ্ধ আলোর বিন্দুটি বড় মধুর লাগে।

ঠিক অমনি একটি স্নিগ্ধ আলো জ্বলে ওঠে পাশের তিনতলা বাড়ীর কোনের একটা ঘরে। ছায়া দেখা দেয় কাঠের জানালার বুকে। ছোট্ট নধর একটি শিশু বুকে চেপে এগিয়ে যায় একটি নারী, পেছনে শিশুর বিছানা দু'হাতে ধরে একটি পুরুষ।

মৃগাঙ্কের দৃষ্টিতে ধরে জ্বালা, মাথা করে ঝিম্‌ ঝিম্‌। একটা আতুর ক্ষুধা গুমরিয়ে ওঠে: অস্থির পদক্ষেপে সে ছাদের উপর হাঁটতে থাকে। পা ধরে যায়, কোমর ব্যথায় টন টন করে। তবু সে ঘুরপাক খেয়েই চলে।

হঠাৎ সে চম্‌কে যায়। একি করছে সে? ক্ষোভে ও দুঃখে ফিরে আসে ঘরে, শ্রান্ত দেহ ছেড়ে দেয় বিছানার উপর। জীর্ণ তক্তপোষ যন্ত্রণায় কোকিয়ে ওঠে।

চারিদিক নীরব নিথর, নিজের হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনে নিজেই চম্‌কে যায় মৃগাঙ্ক।

ধীরে ধীরে একটা কালো পর্দা সরে যায় চোখের সুমুখ থেকে।

বৃদ্ধা মা যাবেন দু'দিন বাদে মরে। বোনগুলি যাচ্ছে পরগৃহে সুখ সন্ধানে। ভায়েরা বড় হয়ে বাঁধবে ঘর, ওদের অপূর্ণ ত কিছুই থাকবে না। কিন্তু বার্দ্ধক্যে ওর নিজের কি রইল?

অন্ধকারে দু'চোখ তার জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে।

আর সবাইর ঘড়া হয়ে উঠবে পরিপূর্ণ। ওর জন্য কেন থাকবে

শুধু তলানি! তিল তিল করে রক্ত জল করে অপরের সুখময় রাতগুলি গড়ে দিয়ে কেন সে বইবে দীর্ঘশ্বাসের বোঝা?

একটা ব্যর্থতার বোবা গোঙানি ঠেলে ঠেলে ওঠে বুকের ভেতর থেকে। বর্তমানের বঞ্চনা ও ভবিষ্যতের রিক্ততা ওর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালো। সেখানে যে কেবলই অন্ধকার—

তেল ফুরিয়ে যাবার মুখে প্রদীপের ছট্‌ফটানির মত একটা অসোয়াস্তি বোধ করে মৃগাঙ্ক।

অদূরের পেটা ঘড়িতে রাত চারটে বেজে যায়। প্রশ্ন ও দ্বন্দ্ব··· জিজ্ঞাসা ও চাহিদা···অসহ যন্ত্রণা·· একটা ভীতি ও শঙ্কা নিয়ে রাত পোহাল ওর।

দিনের আলোতে এলোমেলো চিন্তাগুলি সরল হয়ে আসে। সব ছাপিয়ে একটা সঙ্কল্প মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

পরদিন মেসবাসীরা অবাক হয়ে গেল এতদিন থেকে যাওয়া লোকটার কাণ্ড দেখে। পাড়া-পড়শীরা কেউবা দিল গালি, কেউবা বল্লে—ভালই করেছে ওরা। মাতাল বুড়োর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে বউটা।

৯

এরপর কেটে গেছে কয়েকটি বছর। দেশ যে স্বাধীন হয়েছে তাও আজ তিন বছরের কথা। অন্য দশজনের মত রবিও আশা করছিল সুদিনের। কিন্তু কিছুই হয় না, স্বাধীন ভারতে রেশনের চালের বরাদ্দ হয়েছে আগের চেয়েও অপরিমিত। কাপড় হয়েছে দুষ্প্রাপ্য। সৎজীবন যাপনের পথ হয়েছে অবরুদ্ধ। কালোবাজার হয়েছে পাকাপোক্ত। চারিদিক ভরে গেছে রোজগারহীন মানুষে। দেশ-বিভাগের ক্ষত বিরাট দগ্‌দগে ঘাএর রূপ নিয়েছে। যুদ্ধোত্তর ছাঁটাই, দুনিয়ার আর্থিক অনটন, ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা এবং গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী পরিকল্পনার অভাবে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধ্বসে গিয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজের খোলস ভেঙ্গে পড়েছে। কেরাণী, মাষ্টারী বা বাবুয়ানী কাজে আর কুলিয়ে ওঠে না। পেটের তাগিদে বাপ-ঠাকুর্দ্দার পেশার নেশা ভেঙ্গে গিয়েছে। মুষ্টিমেয় কলকারখানাগুলির চারপাশে তাদের গুঞ্জনের আর শেষ নেই। কিন্তু সেখানেও সে স্থান অকুলান। তার উপর অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারি হচ্ছে। ট্রাইবুনাল জন্ম নিয়েছে। লেবর কমিশনারের উদয় হয়েছে। গভর্ণমেণ্টের সমর্থনে শ্রমিকদের মাঝে নতুন দল গজিয়েছে। অবনীরা যোগ দিয়েছে এ দলের সাথে। ফলে মালিকপক্ষ হয়ে উঠেছে আগের চেয়েও শক্তিশালী। অল্প লোক দিয়ে বেশী কাজ করাবার ফন্দিতে তারা এখন ছাঁটাইর পথ খোঁজে।

কোথাও কোন গোলমাল নেই, কাজ চলেছে নির্ব্বিবাদে। হঠাৎ সেদিন হুলুস্থূলু আরম্ভ হ'ল।

কারখানা কম্পাউণ্ডের এককোণে পাওয়া গিয়েছে চারটে হাতে তৈরী বোমা। পুলিশ এসে হাজির, তল্লাসী চলল, একটা আমগাছের নীচে পাওয়া গেল আরও কয়েকটা রিভলভারের গুলি।

যোগেশকে গ্রেপ্তার করা হ'ল, সেই সঙ্গে ছাঁটাইও হ'ল আটজন শ্রমিক। সে দলে নিজের নাম দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে রবি।

এ নিয়ে কিন্তু কোন আলোড়নের সৃষ্টি হয়না শ্রমিকদের মাঝে। কাজ করে বেতন নিয়ে ঘরে ফেরাকেই সৌভাগ্য বলে মনে করে তাবা, ইউনিয়নের শরণাপন্ন হয় রবি। অবশিষ্ট দু'চারজন কর্ম্মী রবিকে সান্ত্বনা দেয় নানা কথা বলে। এখন আর তারা দুঃস্থ শ্রমিকদেব সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে চায় না। এর আগে সাহায্য করত তারা দলপুষ্ট করার জন্য এবং একটা ভালমানুষীর প্রেরণায়। বহু শ্রমিকের দল ত্যাগের ফলে তারা ধরে নিয়েছে, দুঃখের ক্ষণিক লাঘব করে কোন লাভ নেই, বরং যাতে শ্রমিকদের দুঃখের সাথে পুঞ্জিভূত সীমাহীন অসন্তোষ দানা বেঁধে একদিন আক্রোশে ফেটে পড়ে, তারই প্রতীক্ষায় তারা পথ রচনায় মত্ত। তাছাড়া তাদের ক্ষমতাও আজ সীমাবদ্ধ। আগামী বছর থেকে ইউনিয়নের ক্ষমতা চলে যাবে গভর্ণমেণ্টের সমর্থনপুষ্ট নতুন দলটির হাতে।

কারখানা ব্যারাক ছেড়ে রবি উঠে আসে একটা বস্তিতে। কাজের খোঁজে ঘোরে সে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি। কোথায় পাবে কাজ? চারপাশে যে বেকার মানুষে গিজ গিজ করছে। তবু রবি ঘোরে। ক্লান্তিহীন...বিরামহীন। কাজ নইলে যে তার চলবে না।

সেদিন একটা তাঁত তৈরীর কারখানায় ঢুঁ মেরে ফিরে এসে ঘরের মাঝে ছট্‌ফট্‌ করে রবি। কিছু টাকা ঘুষ দিলে ঢোকা যায় সেখানে, কিন্তু কোথায় টাকা ?

রবির চোখে একটা জ্বালা প্রকাশ পায়।

এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও যক্ষের ধনের মত রক্ষিত ছিল যে জিনিষ— আজ ঘরের খুঁটির ফাঁক থেকে সে বের করে সেই বোতাম ছড়া।

কল্পনায় চিড় ধরেছে রবির। স্বপ্ন আজ অস্পষ্ট। রূঢ় বাস্তব বেপরোয়া। কিন্তু এত সহজে হার মানা চলবেনা কিছুতেই।

রাস্তায় বেরিয়ে আসে রবি। পাড়ার স্যাক্‌রার কাছে গিয়ে বোতামছড়া ফেলে দেয়। বার আনা ওজন করে এবং অনেক কিছু বাদ দিয়ে চল্লিশটি টাকা রবির দিকে তুলে ধরে স্বর্ণকার।

সোনার মূল্যমানের জ্ঞান নেই রবির। তবুও মহা মূল্যবান স্বর্ণের এত অল্পমূল্য শুনে ওর জানি কেমন খট্‌কা লাগে। ফেরৎ চায় সে বোতাম।

—বিক্রী করবেনা ত সকালবেলা এসে মাপুনি ধরালে কেন ? নাও—একটা টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি। বউনির সময় খিচ্‌ খিচ্‌ করোনা।

ফেরৎ চাইতেই একটা টাকা বেড়ে গেল। রবির সন্দেহও বেড়ে যায়।

—এ আমার জিনিষ নয় দাদা, বোতামটা দিন, যার জিনিষ তাকে জিজ্ঞেস করে আসছি।

গজ্‌ গজ্‌ করে স্যাক্‌রা বোতাম ছুঁড়ে দেয়।

বড় রাস্তার ধারে সু-সজ্জিত প্রকাণ্ড গয়নার দোকানটায় ঢুকে সসঙ্কোচে রবি বোতাম বের করে।

দোকানের মোটা মতন মালিক রবির আপাদমস্তক লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করে, কি হবে ?

—আজ্ঞে—বিক্রী করব।

কষ্টি পাথরে দুটি আঁক কষে বোতামছড়া হাতের উপর নিয়ে নাচাতে থাকে লোকটা।

—এতে সোনা নেই বল্লেই হয়, কোত্থেকে এনেছ ? তারপর ফের বোতামছড়া ভাল করে দেখে নিয়ে বলে, যেটুকুন সোনা রয়েছে, ওতে গোটা দশেক টাকা পেতে পারো।

লোকটার দিকে তাকিয়ে বহুদিন আগেকার দেখা চিড়িয়াখানায় 'হিপোদের' কথা মনে পড়ে রবির। প্রায় এমনি বড় হাঁ—এমনি প্রকাণ্ড দেহ।

বোতামটা ফেরৎ নিয়ে আর ইতস্তত: করেনা রবি। পাড়ার স্যাকরার কাছে ফিরে এসে বিক্রী করে দেয়।

মিনুর আরও একটি মেয়ে জন্ম নিয়েছে। ছেলে নন্তু বেশ বড় হয়ে উঠেছে। রবির সংসার বেড়ে গেছে। কারখানার স্বল্প বেতনে কুলিয়ে ওঠা যায়না। ওভার টাইম বাঁধা হয়ে যায় ডিউটির মত। ছেলে-মেয়েদের গায়ে যেন দুঃখের আঁচড় না লাগে ; রবি চেষ্টা করে আপ্রাণ।

যুদ্ধোত্তর অ-কাল দিনের পর দিন হয়ে উঠছে অসহনীয়। মাঝে মাঝে রবির কেমন যেন ভয় করে। সে সীমা ছাড়িয়ে পরিশ্রম করে, তবু ভয় কাটেনা, সমস্যার লাঘব হয়না।

এ মন্দার বাজারেও রবিদের কারখানা বেশ চলছিল। যদিও

জাপানী, ইউরোপ ও আমেরিকার তাঁতে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে, তবুও মার খাবার ভয় ছিল না ওদের মালিক পক্ষের। গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে মোটা টাকা কর্জ্জ পেয়েছে এবং অর্ডারও রয়েছে গভর্ণমেণ্টের মারফৎ। কিন্তু লাভ নাকি হচ্ছেনা।

গৌরী সেনের টাকা লুটে নেবার সুযোগ হাতছাড়া করার মত বোকা তারা নয়। ফলে দোষটা গিয়ে চেপেছে শ্রমিকদের ঘাড়ে। "বেশী সময় নিয়ে কম কাজ দিচ্ছে" এ অজুহাতে ছাঁটাইও চলে মাঝে মাঝে।

ফের কয়েকদিন যাবৎ ছাঁটাইর কথা উঠেছে। কাজ পেয়ে রবির মুখে যে হাসিটুকু ফুটেছিল, ভয়ে কোথায় তা হারিয়ে গেছে খুঁজে পাওয়া যায় না।

সময় বুঝে জ্বর এসে চেপে ধরল। আমল দিতে চায়না রবি। প্রথম দিকে দু'একদিন জ্বর নিয়েই কাজ করে এল। বেড়ে গেল জ্বর। বিছানা নেয় রবি।

দেড় মাস পর টাইফয়েডে ভুগে কঙ্কালসার দেহ নিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল সে।

হাতের সামান্য টাকা কড়ি, ঘরের দু'একটা অতি সখের পেতলের থালা, মিনুর হাতের রূপোর চুড়িগাছা, এমন কি সখ করে কিনে দেওয়া শাড়ীগুলি পর্য্যন্ত মিনু বিক্রী করে দিয়েছে—চিকিৎসার খরচ চালাতে।

ঘরের মাঝে বসে থেকে রবির মাথা গরম হয়ে ওঠে, মিনু বেরোতে দেয়না। আরও কিছু দিন কেটে যায়।

রবি অনেকটা সেরে উঠেছে। সেদিন সে মিনুর মানা ঠেলে কারখানার দোরে এসে দাঁড়ায়। দরওয়ান ওর পাণ্ডুর মুখের দিকে

চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পাঠিয়ে দেয় কেরাণীর ঘরে, এক হ'প্তার পুরো বেতন দিয়ে কেরাণীবাবু জানিয়ে দেয়, রবিকে ছাঁটাই করেছে কর্তৃপক্ষ।

দু'চখে আঁধার নেমে আসে রবির, কাঁপতে কাঁপতে সে ফিরে আসে ঘরে।

কিন্তু বসে থাকলে যে তার চলবে না। পাগলের মত রবি খোঁজে কাজ। এবার তার ভগ্নস্বাস্থ্যই হয়ে দাঁড়াল বিরাট প্রতিবন্ধক।

মাস ঘুরে আসে, কাজ আর জোটে না। সবচেয়ে কষ্ট হয় মিনুর জন্য; বয়েস বাইশ পেরোয়নি, এর মধ্যেই হয়ে গিয়েছে অদ্ভুত রকম গম্ভীর। কয়েকদিন যাবৎ বাইরে ঘন-ঘন যাতায়াত আরম্ভ করেছে। কিছু জিজ্ঞেস করলে ডাগর দুটি চোখ তুলে নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সাহস পায়না রবি তাকে বেশী ঘাঁটাতে।

সেদিন কাজের জন্য ঘোরাঘুরি করে পরিশ্রান্ত দেহে বাড়ী ফিরে এসে মেঝের উপর উবু হয়ে শুয়েছিল রবি। ক্ষিধেতে পেটের ভেতর চোঁ চোঁ করতে থাকে, কিন্তু শ্রান্ত দেহ আরাম পেয়ে নড়তে চায়না।

বড় ছেলে নন্তু পাশ দিয়ে ঘুরে যায়। কি যেন বলবার রয়েছে ওর। ছোট মেয়েটা ঘরের কোনে গুটিশুটি হয়ে বসে খেলা করছে। আদুল গায়ে কাদামাটি লাগিয়ে এমন হয়ে রয়েছে যে, মনে হয় কতদিন ওর স্নান হয়নি।

নন্তু ছোট একটি ঠোঙ্গা নাবায় বাপের কাছে। জিব দিয়ে শুষ্ক ফাটা ঠোঁট দুটা চেটে নিয়ে বলে, বাবা! মার আসতে দেরী হবে। চার পয়সার ছোলা মুড়ি কিনে রেখে গিয়েছে। আমাদের ভাগ করে দিয়ে তোমাকেও খেতে বলেছে।

—কোথায় গিয়েছে সে? হাত বাড়িয়ে ঠোঙ্গা থেকে কয়েকটা ছোলা মুখে ছুঁড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে রবি।

উত্তর দিতে নন্তু একটু ইতস্তত: করে।

রবি ছোলা মুড়ি মেঝেতে ঢেলে ভাগ করতে থাকে। ঘরের কোন থেকে ছোট মেয়েটা খেলা ফেলে উঠে এসে বাপের পাশে বসে।

—তোর মা কোথায় গিয়েছে বল্লিনে নন্তু? ছোট মেয়েটির হাতে দুটি তুলে দিয়ে ফের প্রশ্ন করে রবি।

—মা!...ঢোক গেলে নন্তু। মা বড় রাস্তার ধারে হলদে বাড়ীতে কাজ নিয়েছে।

রবি ঠিক বিশ্বেস করতে পারেনা কথাটা। নন্তুকে প্রশ্ন করে পুনবায়। শুষ্ক মুখে নন্তু সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে।

বোবা দৃষ্টিতে রবি চেয়ে থাকে নন্তুর মুখের দিকে।

—মিনু দাসত্ব করবে অন্যের বাড়ী। পরপুরুষের হুকুম তামিল কববে তার মিনু সামান্য কয়েকটি টাকার জন্য! ওব এত দুঃখ এত পবিশ্রম কি অর্থহীন হয়ে যাবে?

সহকর্মীদের ভেতর অনেকের স্ত্রী ঝি-গিরি করছে। তাদের কাছে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সে যে এমনটি চায়নি কখন। বিয়ে করে স্ত্রীকে, জন্ম দিয়ে পুত্র-কন্যাকে খাওয়াতে পারবে না মেহন্নতি পুরুষ মানুষ। একথা কখন ভাবতে পারেনি সে।

এ কি হয়ে গেল? শরীরের রক্ত জল করেও ঠেকান গেলনা দারিদ্র্য-রাক্ষসকে। টাকার জন্য বেরোতে হোল স্ত্রীকে।

বুকের ভেতরটা গুঁড়িয়ে যেতে চায়। সোজা হয়ে বসে রবি। হাতের মুঠি খুলে যায়। ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে ছোলাগুলি।

বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে নস্তু সরে আসে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়।

ঘরের মাঝে এসে বাসা বাঁধছে গাঢ় অন্ধকার। দূরের একটা বাড়ীর রেডিওর গানের সুর ভেসে আসে! ছোট মেয়েটা অনেকক্ষণ হোল মা ছাড়া রয়েছে। অন্ধকারের মাঝে মাকে না পেয়ে সে চিৎকার আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পর নিজ থেকেই সে কান্না থামায়। মাটিতে পড়ে থাকা ছোলাগুলি হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে কুট্ কুট্ করে চিবুতে থাকে।

রবির মাথাটা বড্ড ভারবোধ হয়, হাতের উপর মাথা রেখে সে চোখ বোজে। কিছুক্ষণ পর দু'চোখে নেমে আসে ঘুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, মনিব-বাড়ীতে মিনু এক পাঁজা বাসন মাজছে; হাতের শিরা ফুলে উঠেছে; অহেতুক গিন্নী বকুনি দিচ্ছে; মিনু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের কোনে জলবিন্দু টল্ টল্ করছে।

এদিকে মিনু ফিরে আসে কাজ থেকে। একটা গামলায় করে ভাত ও তরকারী নিয়ে এসেছে সে। যা তরকারী এনেছে তাতে সবাইর হয়ে যাবে। চারটি চাল ফুটিয়ে নিলেই হোল।

মিনু পরণের শাড়ীখানা ছেড়ে একখানা ময়লা কাপড় দড়ি থেকে নামিয়ে নেয়। দশহাত শাড়ী ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছয় হাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অসংখ্য তালিতে কাপড়ের ওজন বেড়ে গেছে, সমস্ত দেহ ঢাকা পড়েনা। কোমর থেকে বুকের উপর দিয়ে কাঁধ পর্য্যন্ত গিয়েই ফুরিয়ে যেতে চায়।

মিনু রবির পাশে এসে বসে। তার হাতের আঙ্গুলগুলি রবির হাড় বের করা বুকের উপর চলাফেরা করে।

শিউরে উঠে রবি চোখ মেলে তাকায়। একটা দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত

হাওয়া ওর মুখের উপর আঘাত করে। পাশে অন্ধকারে আবছায়ত মিনুর দেহ অনুভব করে সে।

একটু নড়া কিংবা একটু সাড়া দেয়না রবি। ক্ষোভে ও অভিমানে মনের ভেতর ওর ফেনিয়ে ওঠে। মিনুর নরম আঙ্গুলগুলি স্বামীর বুকের পাঁজর ছেড়ে তার মাথার অবিন্যস্ত চুলের ভেতর দিয়ে পথ করে চলতে থাকে।

অন্ধকারে মিনুর দেহ আরও সান্নিধ্য খোঁজে। পাশ ফিরে রবি।

স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস করে মিনু বলে, রাগ করেছ ? কিন্তু আগে বল্লে আমাকে কি যেতে দিতে—

রবি কোন উত্তর দেয়না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিনু বলে চলে, তোমার শরীর কি হয়ে গিয়েছে। এমনভাবে আর ক'দিন বাঁচবে, আমি বাড়ী বসে থেকে কি করব। ধার কর্জ্জ করেই বা চলবে ক'দিন। একটু খেটে কয়েকটা টাকা দিয়ে যদি তোমাকে একটু আসান দিতে পারি, তাতে রাগ কোচ্ছ কেন। দোহাই তোমার, অমন চুপ করে থেকনা।

—আর ক'টা দিন অপেক্ষা করতে পারলেনা মিনু ? রবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ক্ষুব্ধ স্বর।

—অপেক্ষা করে করে আজ কি অবস্থায় এসে পৌছেছি। অমন ভরাট বুক তোমার শুকিয়ে হয়েছে হাড়ের খাঁচা। বসে থেকে এ কি করে চেয়ে দেখব ?

দীর্ঘশ্বাসে রবির বুক ভরে যায়।

স্বামীর কপালের উপর হাত বুলিয়ে মিনু বলে, দুঃখ করোনা;

যে কাল পড়েছে শুধু কাটিয়ে উঠতে দাও; অন্ততঃ তোমার শরীর একটু সেরে উঠুক—

রবি স্ত্রীর একটা হাত নিজের বুকের উপর চেপে ধরে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে। তার চোখের উষ্ণ লোনা জলের ধারা গালের উপর দিয়ে পথ করে নামতে থাকে।

১০

ভাতের থালা গামলা হাতে নিয়ে সকালবেলা মনিব-বাড়ীতে কাজে ঢোকে মিনু।

রাস্তার পর একটু বাগান, তারপর বাড়ী, এর পেছনে ছোট্ট একটু উঠোন এবং উঠোনের একপাশে রান্নাঘর।

বাজার, রেশন প্রভৃতি বাইরের কাজের জন্য রয়েছে একজন ছোকরা চাকর, নাম তার মনু, গোলগাল বেঁটে নেপালী ধরণের ফর্শা চেহারা। পাঁচ বছর বয়েস থেকে সে এ বাড়ীতে কাজ করছে। এখন প্রায় আঠারো বছরের যুবক, অত্যন্ত বিশ্বস্ত; বাড়ীর বহুকাজে তাকে না হলে চলেনা।

মনু গিয়েছে বাজারে, আসবার এখনও দেরী আছে। মিনু একটু বিশ্রাম করছিল।

সাঁড়াশী, সূঁই, সুতো ও কয়েকটুকরো রঙিন ছিট একটা ছোট বাক্সে ভরে গিন্নী এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ায়।

—হ্যাগা···ঘুমুচ্ছ না—কি? মিনুকে জিজ্ঞেস করেন তিনি।

মিনু ধরফড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়।—কিছু বলছেন মা?

—বাইরের ঘরের কয়েকটি কৌচের নানা যায়গা ছিঁড়ে গিয়েছে। সেগুলি মেরামত করতে হবে। আমার সাথে এসো দিকি···

—আমি যে ও কাজ কখন করিনি। মিনু সসঙ্কোচে উত্তর দেয়।

—কোনদিন করোনি · এখন করবে। ভয় নেই, আমি সব দেখিয়ে দোব। একটু হেসে গিন্নী মিনুকে আশ্বাস দিয়ে এগিয়ে যান্।

স্থূলবপু গদি আঁটা কৌচগুলির ঢাকনি খুলে একপাশে রাখা হয়। কোনটার গদিতে সাঁটান চক্‌চকে শক্ত কাপড় ফেটে গিয়ে ভেতরকার নারকেলের ছোব্‌ড়া বেবিয়ে পড়েছে। কোনটার স্প্রিং কাৎ বা উল্টে গিয়েছে।

গিন্নী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এক একটি কোচ পর্য্যবেক্ষণ করে মিনুকে আদেশ কচ্ছেন। মিনু ঝটপট আদেশ তামিল করে চলেছে।

এ-ফাঁক ও-ফাঁক থেকে দু'একটা ছারপোকা বেরিয়ে ছুটে পালাতে চাইছে। গিন্নীঠাকুরণ মহানন্দে সেগুলি ধরে পায়ের আঙুলের চাপে থেঁৎলে দিচ্ছেন। মেঝের এখানে ওখানে কাল্‌চে রঙের দাগ লেগে যাচ্ছে। দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস ভরে উঠছে।

মনু বাজার থেকে ফিবে আসে, মিনু ছুটি পায়।

রান্নাঘরে ফিরে এসে বঁটি নিয়ে মাছ কুটতে বসে মিনু, ছোট্ট একটু ধাক্কা দিয়ে পাশে এসে বসে মনু। ওর বিড়ি খাওয়া কালো ঠোঁটের কোনে খেলে এক টুক্‌রো হাসি।

মনুর চোখের দিকে তাকিয়ে, শিউরে ওঠে মিনু।

হাতের মাছ কাটা বন্ধ হয়ে যায়, বঁটির উপর সোজা দৃষ্টি রেখে বসে থাকে সে কাঠ হয়ে।

—এ ··কি·· ভয় পেয়েছ ? আমি কি খেয়ে ফেলব ? শুধু··· এই···এই·· একটু···সুঁচালো মুখ করে মনু চোখ টিপে হাসে।

মনুর ক্ষুধার্ত্ত কুৎসিৎ দু'চোখের দৃষ্টি মিনুর দেহ ঘিরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে চায়।

মনু আরেকটুকু সরে আসে।

মরিয়া হয়ে মিনু বলে, অমন করে অত্যাচার করলে আমাকে চাকরী ছাড়তে হবে।

হেসে ওঠে মনু, বলে, আমি যা চাই তা না পেলে তোমাকে আর কষ্ট করে কাজ ছাড়তে হবে না, আমিই ছাড়াব। আমার পাওনা না দিলে কেউ এখানে টিকতে পারেনা। ভেবে পথ ঠিক করে নিও...

মনু উঠে চলে যায় ঘর ছেড়ে।

ছোট্ট পরিবার, খাটুনী কম। বেশ চাকুরীটি। কিন্তু মনুর অত্যাচার যদি দিনের পর দিন বেড়ে চলে তা হলে ?

মিনু এটুকু বুঝেছে, বছরের ব্যবধানে মনুর একটা দাবী জন্মেছে এই সংসারের উপর। ওর বিপক্ষে নালিশ করে কোন লাভ নেই, বিশ্বাস করলেও গিন্নীমা মিনুর পক্ষ নিয়ে মনুকে কিছুই বলবেন না।

চিন্তিত হয়ে ওঠে মিনু।

আজ কি রান্না হবে, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে মিনুকে নির্দ্দেশ দিচ্ছিলেন গিন্নী।

এমন সময় বাড়ীর মালিক অনিমেশ বনার্জ্জির গাড়ী ফিরে আসে। এত সকাল করে ফিরে আসা তার স্বভাব নয়।

—ফিরলে যে—কি হয়েছে ? গিন্নী প্রশ্ন করেন।

—খবর রাখোনা ; পূর্ব্ব বাংলায় ফের দাঙ্গা লেগেছে। শেয়ালদায় পাকিস্থান থেকে খালী গাড়ী আসছে। সারা কলকাতায় হুলুস্থূলু পড়ে গিয়েছে। মিঃ বনার্জ্জি উত্তেজনায় ছট্‌ফট্ করতে থাকেন।

গিন্নী ঠোঁট ফুলিয়ে বলেন, পাকিস্থানে দাঙ্গা লেগেছে এজন্য এখানে বসে তোমার স্বস্তি নেই। সেখানে কে এমন হিতৈষী রয়েছে আমাদের ! গিন্নীর স্বরে শ্লেষের সুর ধ্বনিত হয়।

স্ত্রীর কথায় অনিমেশ বনার্জ্জির উত্তেজনা যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়।

বনার্জ্জি সাহেব ব্যথিত কণ্ঠে বলেন, আমাদের গাঁয়ের অঞ্চলটেই হাঙ্গামা সুরু হয়েছে। দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে জ্যাঠামশাইদের জন্য।

—সেই জ্যাঠামশাই ! লজ্জা করেনা অমন আত্মীয়ের কথা বলতে. গিন্নী ফুঁশিয়ে ওঠেন।

ব্যারিষ্টার সাহেব নিরুত্তরে চুপ করে থাকেন। চেম্বারে বসে অন্য দশজনের মত তিনিও স্মরণ করছিলেন পাকিস্থানের আত্মীয়দের কথা। ছোট বেলায় বাবার সাথে বার কয়েক গিয়েছিলেন পিতৃভিটায়। পিতার মৃত্যুর পর বহুদিন হোল সে পাট উঠে গিয়েছে। প্রথমদিকে তবুও চিঠিপত্র চলত, ধীরে ধীরে তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

জাপানী বোমার ভয়ে যখন সবাই কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছিল। তখন স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি চিঠি দিয়েছিলেন জ্যাঠামশাইকে। পর পর দু'খানা চিঠি লিখেও যখন কোন উত্তর পেলেন না, তখন স্ত্রীর হাতে অপমানের একশেষ হতে হয়েছিল তাঁকে।

স্বামীর ভাবান্তর ব্যারিষ্টার গিন্নীর দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি বলেন,

—ওসব চিন্তা রেখে এখন উপরে চলো।...

কয়েকদিন পর, উৎকণ্ঠিত মনে দৈনিক খবরের কাগজখানা নাকের সুমুখে ধরে মিঃ বনার্জ্জি পাকিস্থানের দাঙ্গার খবর পড়ছিলেন। অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শীর শিহরণ লাগান বিবরণী বেরিয়েছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরে।

লক্ষ লক্ষ লোক জীবন নিয়ে পালিয়ে আসছে। পুলিশ পাহারায় ট্রেণ চলাচল আরম্ভ হয়েছে। অগণিত মানুষ গাড়ীর আশা ছেড়ে হেঁটে রওনা দিয়েছে। ভয়-চকিত, গৃহ-তাড়িত, দুর্গত মানুষের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে নানা পথে ও নানাদিকে। মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের অবিচারের ও লাঞ্ছনার কাহিনীতে ভরে আছে পত্রিকার প্রতিটি কলম।

রিক্ত, গৃহহারা মানুষের ক্রন্দনে ভারী হয়ে উঠেছে কলকাতার বাতাস। এখানে ওখানে ছোট খাট দু'একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে। পুলিশ ও সৈন্য ছেয়ে ফেলেছে কলকাতা। আত্মীয়স্বজনের বিয়োগ-ব্যথাতুর প্রতিহিংসাপরায়ণ মন সরকারের সশস্ত্র ট্যাঙ্কের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে থেমে যায়। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ সরকার কিছুতেই বরদাস্ত করে না সাম্প্রদায়িকতা।

সেদিন মিনু কলের ধারে বসে বাসন মাজছিল। রান্নাঘরের দরজায় বসে মনু লালসায় বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করছিল মিনুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি সঞ্চালন।

আকাশে কালো মেঘ থম্ থম্ করছে। বর্ষণ আরম্ভ হবার বেশী বাকী নেই, মেঘলা-আবছা-অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে চারপাশে।

বাইরের খোলা দরজা দিয়ে একজন বৃদ্ধ মানুষ ঘরে প্রবেশ করে, তার একমাথা চুল জট্ পাকিয়ে উঠেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে মুখ ভরে আছে। দুই চোখ টক্‌টকে লাল, কপালের পাশের শিরাদুটি উত্তেজনায় ফোলা। গায়ে একখানা গলাবন্ধ কোট, কোটের অবস্থাও

অত্যন্ত শোচনীয়। নীচেকার অর্দ্ধেক ছিঁড়ে ঝুলে আছে অদ্ভুতভাবে।

মনু মিনুর দেহের উপর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে হাঁক দেয়।

—কাকে চাই?

বৃদ্ধ যেন শুনতে পায়না।

—কাকে চাই, কে তুমি? মনু রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে।

বৃদ্ধের সম্বিত ফিরে আসে কিছুটা। নোংরা হাত দিয়ে মুখের দাড়িগুলি চুলকিয়ে ভাঙ্গা অস্পষ্ট স্বরে বলে,—অনির বাড়ী নয় এইটে?

মনু বুঝতে পারেনা তার কথা। বলে, অনি...কে অনি? কার কাছে দরকার তোমার?

—অনিকে চেননা? বৃদ্ধ মাথা নাড়তে থাকে অর্থহীনভাবে।

মনু বিরক্ত হয়ে ধম্‌কে ওঠে, পাগলামো করতে হবেনা। বেরিয়ে যাও—

নীচেতে গোলমাল শুনে মিঃ বনার্জ্জি নেমে আসেন। মনিবকে দেখে মনুর বীরত্ব জেগে ওঠে। এগিয়ে গিয়ে সে বুড়োর ঘাড় ধরে ধাক্কা দেয়।

—এই···এই···মিঃ বনার্জ্জি ত্রস্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসেন। জ্যাঠামশাইর চেহারার একি পরিবর্ত্তন। যদিও বহু বছরের ব্যবধান তবু ঠিক চিনেছেন তিনি। মাথা নীচু করে বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করেন।

মিঃ বনার্জ্জির দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে বৃদ্ধ।

মিঃ বনার্জ্জি ঝুঁকে বলেন, আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না জ্যাঠা-মশাই? আমি যে অনিমেশ—

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে হাসতে থাকে।

এ অর্থহীন হাসি দেখে ভয় হয় বনার্জ্জির! জ্যাঠাইমা, জ্যাঠতুত বোন

ও সংসারের কে কোথায় রয়েছে! জ্যাঠামশাই বা কোথেকে এলেন এ অবস্থায়?

একটা সাংঘাতিক কল্পনায় মনের মাঝে নানা প্রশ্ন ভিড় করে।

মিঃ বনার্জ্জির বড় ছেলে বাবাকে প্রশ্ন করে, পাগলটা কে বাবা?

কথাটার কর্কশতা আঘাত করে সকলকে। মিঃ বনার্জ্জি ছেলেকে ধমক দেন।

কিন্তু কথাটা কানে যেতেই বৃদ্ধের হাসি থেমে যায় হঠাৎ করে।

অনি! এ তোর ছেলে নয়? বেশ সুন্দর কথা বলে ছেলেটি। কি নাম তোমার? একটু কাছে এসো দাদু···

স্বাভাবিক শোনায় বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজের জামা-কাপড়ের দিকে তাকিয়ে মনের মাঝে যেন লজ্জিত হয় বৃদ্ধ। বলে, বৌমা! পাগল ভেবে দূরে দাঁড়িয়ে রইলে? অনি, তোর বউকে ডাক···কিছু খেতে দিক্। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

বনার্জ্জি-গিন্নী এক কাপ দুধ নিয়ে এসে স্বামীর কাছে দাঁড়ায়।

—ভয় পাচ্ছো মা! লজ্জিত হয়ে বুড়ো একটু হাসে। মাথা ঠিক থাকেনা সবসময়ে মা। সাজান সংসার ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। চোখের সুমুখে সবাইকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। কেন যে তখন মরে যাইনি···

কথা শেষ করতে পারেনা বৃদ্ধ। একটা দুঃসহ যাতনায় তার মুখের পেশী কুঁচকে যায়। চোখদুটি ফেটে পড়তে চায়। হঠাৎ সে মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুঁড়ে লাফিয়ে অনিমেশের সুমুখে এসে দাঁড়ায়।

ভয়ে বনার্জ্জি-গিন্নীর দুধভর্ত্তি হাতের কাপ মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে যায়।

মিঃ বনার্জ্জির কাছে স্থির হয়ে দাঁড়ায় বৃদ্ধ। ফিস ফিস করে বলে,—এর একটা ব্যবস্থা কর অনি। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নিয়ে এ ছিনিমিনি খেলার জবাবদিহি চাইতেই হবে। সমুচিত শাস্তিবিধান করতে হবে রাজনৈতিক কসাইদের। মানুষের জীবনকে জীবন বলেই মনে করে না। এ্যাঃ—এযেন পাশার দান···

মিঃ বনার্জ্জির চোখে জল এসে পড়ে।

—কি—তুই চুপ করে আছিস্? ওঃ...বুঝেছি! তোরাও ওদেরই দলে! বেশ...

ক্ষিপ্ত গতিতে বৃদ্ধ বেরিয়ে যায় রাস্তায়।

মিঃ বনার্জ্জি নিজকে সাম্‌লে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। বিশাল-জনারণ্যে খুঁজে পাওয়া যায়না জ্যাঠামশাইকে।



জ্যাঠামশাইর আবির্ভাব ও তার নিদারুণ কাহিনী প্রত্যেকের মনের মাঝে একটা ত্রাসের সঞ্চার করেছে। প্রকাণ্ড বাড়ীটার উপর নেমে এসেছে একটা নিঃসাড় নিস্তব্ধতা।

ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে মিনু ভাবছিল জ্যাঠামশাইর কথা। বৃদ্ধবয়সে কতবড় না শোক পেয়েছেন তিনি!

দু'চোখে একরাশ বন্য পশুর লোলুপতা নিয়ে মনু এসে দাঁড়ায়।

মিনুর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা মুহূর্ত্তে গুলিয়ে একাকার হয়ে যায়।

—কি গো নাগরী !—খেয়াল আছে তোমার ?

একটা অস্থির আনন্দে মনুর যৌবন যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যেতে চায়। চুপ করে থাকলে চলবে না। আজ আমার চাই-ই। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময় দিলুম।

মিনুর দেহের উপর ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে মনু বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

মিনু দাঁড়িয়ে থাকে স্থানুর মত। বুদ্ধিশুদ্ধি ওর কিছুক্ষণের জন্য লোপ পেয়ে যায়।

দেহ-লোলুপ ছেলেটার পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নাই। সন্ধ্যাব আঁধারে নেকড়ের মত হাঁমাগুড়ি দিয়ে যদি লাফিয়ে পড়ে তা হলে ?

কল্পনা করে ভয়ে মিনু শিউরে ওঠে।

অসম্ভব এখানে থাকা, এখান থেকে চলে যেতেই হবে। সন্ধ্যার সুযোগ দেওয়া চলবেনা ওকে : কিন্তু এ মাসের প্রায় পঁচিশ দিনের বেতনের টাকা হযেছে প্রাপ্য। একবার কাজ ছেড়ে বেরোলে পাওযা যাবে না সে টাকা। বারটি টাকা কম কথা নয়।

মতলব ফাঁদে মিনু।

দুপুরে ভাত নিয়ে বাড়ী যাবার সময় গিন্নীর কাছ থেকে সংসারের অনটনের কথা বলে অগ্রিম দশটি টাকা সে চেয়ে নেয়। দুটি টাকাব জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু উপায় যে নেই...

বনার্জ্জি বাড়ী থেকে কাজ ছেড়ে এসে একটা প্রকাণ্ড দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পায় মিনু। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা নতুন চিন্তা ভাবিযে তোলে।

বসে থাকলে চলবেনা। বাড়ী বসে থাকতে ভালও লাগেনা। তা'ছাড়া এখনও রবির কোন কাজ জোটেনি। এ অবস্থায় বসে থাকলে চলবে কি করে ?

কিন্তু...

নিজের দেহের দিকে চেয়ে মিনু কাজ করার উৎসাহ পায়না ভেতর থেকে। ঝি-জীবনের বর্ণনা, যা শুনে আসছে জ্ঞান হয়ে অবধি তার সত্যতা নিজের উপর দিয়ে উপলব্ধি করে সে ভয় পেয়ে গিয়েছে। কাজ খুঁজতে বেরোবার আগে থমকে দাঁড়ায় মিনু। ভাবে সে, করবেনা আর কাজ! তবু তাকে বেরোতে হয়। না খেয়ে মরার হাত থেকে বাঁচতে হলে কাজ তাকে জোগাড় করতেই হবে।

যামিনীভূষণ লেনে একটা চাকরী আছে। খোঁজটা এসেছিল দিন দুই আগে। দুপুরবেলা সেখানে খোঁজ করে শোনে, তারা লোক নিয়ে নিয়েছে।

ব্যর্থমনোরথ হয়ে মিনু ফিরছিল ঘরে। পাশের প্রকাণ্ড সাদা রংয়ের ফটকওয়ালা বাড়ী থেকে একজন দরওয়ান ওকে ডাকে।

বাইরের প্রত্যেকটি পুরুষের উপর মিনুর একটা অবিশ্বাস ও ভীতি জন্মে গিয়েছে ইদানিং। তবু সে চলা থামিয়ে দাঁড়ায়।

—কাজের জন্য গিয়েছিলে ওবাড়ী ? প্রশ্ন করে লোকটি।

—হ্যাঃ—লোক নিয়ে নিয়েছে তাই ফিরে যাচ্ছি—মিনু উত্তর দেয়।

—ঘর কোথায় তোমার ?

—ঐ ওদিকের বস্তিতে, পূবদিকটা বাঁ-হাত দিয়ে দেখিয়ে পা বাড়ায় মিনু।

—আমাদের এখানে একজন লোকের দরকার রয়েছে। কাজ করবে তুমি?

হাতের পিঠেতেই যে এভাবে কাজ পাওয়া যাবে আশা করতে পারেনি মিনু। ওর মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। দরওয়ানকে জিজ্ঞেস করে, কি কাজ?

—কাজ বেশী নয়। বুড়ো গিন্নীমা, ছেলে ও ছেলে বউ নিয়ে সংসার। তার ভেতর গিন্নীমা তোমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। কেবল দুটি মানুষের রান্না ও তাদের ফাই-ফরমায়েশ খাটা বই আর বিশেষ কিছু নয়।

—কত বেতন দেবে?

—আগেকার ঝি বিশ টাকা করে পেত। তুমি যদি কাজ করো তাই পাবে, করবে কাজ?

—আমি কিন্তু ভাত নিয়ে যাব বাড়ীতে। সে নিয়ে কোন গোলমাল হবে না ত...

—বাড়ী দেখে বুঝতে পাচ্ছোনা। দরওয়ান সগর্ব্বে প্রকাণ্ড বাড়ীটার দিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। ওসব ভয় নেই, কাজে যোগ দিলে তখন বুঝতে পারবে কেমন মনিব।

কাজে ঢুকে যায় মিনু।

বাড়ীর গিন্নী পুজো-পার্ব্বণ নিয়ে থাকেন। মিনুর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। বাড়ীর একমাত্র ছেলে, পিনাকী রায় তার নাম। স্বাস্থ্যবান সুশ্রী চেহারা, ঘরে তার সুন্দরী স্ত্রী। কিন্তু কেমন যেন ছন্নছাড়া তাদের চাল-চলন।

সোসাইটি গার্ল শর্ব্বরীকে দেখে বড় পছন্দ হয়েছিল পিনাকীর।

নল থেকে বেরিয়ে যাওয়া গুলির মত শর্ব্বরী দুর্ব্বার। কোন বাধা, কোন মান-অভিমানকে সে গ্রাহ্য করেনা। কত ছেলের চোখের জল শুকিয়েছে তার হাসির গমকে। কত মেয়ের চোখের কোন টলমলিয়ে উঠেছে তার কার্য্যকলাপে। সমস্ত জেনেও পিনাকী বিয়ে করে শর্ব্বরীকে। তার ধারণা ছিল, ঘরে এসে শর্ব্বরী হবে শান্ত, এখানেই ভুল হয়েছিল তার। শর্ব্বরী মানেনি বাঁধন, দু'দিনেই স্বামী তার কাছে হয়ে যায় পুরোনো। এক বোঝা ব্যথা চেপে পিনাকী নেয় গৃহের নিরিবিলি কোনটিতে আশ্রয়।

* * * *

মিনু উনুনে আগুন দিয়ে দিয়েছিল, উনুন ধরে যেতেই ঝক্‌ঝকে কেৎলীটা বসিয়ে দেয়। বউ-রাণীর জন্য ওভালটিন এবং অন্যান্যদের জন্য চা তৈরী করতে হবে।

বৌ-রাণীর ঘর থেকে একটা রেকাবীতে করে দামী মাখন ও বিস্কুট নিয়ে আসে সে। নতুন টিনকাটা বিস্কুটের মিষ্টি গন্ধে ভরে যায় ঘর। ওভালটিন তৈরী করতে করতে অবোধ লালা গিলে নেয় মিনু।

কাল রান্না হয়েছে রাজ-ঝিঙ্গে। আজ কি চাল রান্না হবে! সকালের খাওয়া শেষ করিয়ে দুপুরের জন্য ভাবে মিনু।

ভাড়ার ঘরে সারি দিয়ে সাজান রয়েছে নানা আকারের সব চালের ড্রাম। রেশনের চাল এ বাড়ীর লোকের পেটে সহ্য হয়না। নানা জায়গা থেকে নানা নামের চাল নিয়ে এসে যোগান দিয়ে যায় চালের দালালরা।

ঝি-চাকরদের জন্য অবশ্য রেশনের চালই বরাদ্দ।

শালি-ঝিঙ্গে, রাজ-ঝিঙ্গে, কালোজিরে, গোবিন্দভোগ, চন্দনশালী, কনকচূর, পেশোয়ারী প্রভৃতি সব নামকরা সুগন্ধি চাল রয়েছে সুমুখে পড়ে। মিনু বেছে নেয় গোবিন্দভোগ। ছোট ছোট সুগন্ধে ভরা এক মুঠি গোবিন্দভোগ সে মুখে পুরে দেয়। মিষ্টি মিষ্টি চালগুলি চিবিয়ে খেতে বড় সুস্বাদু লাগে।

বউ-রাণী ও দাদাবাবুর জন্য সে একপো চাল মেপে নেয়। বড় লোক মানুষ, পরিশ্রম নেই, তাই খোরাকী কম। কাঁকর বাছার ঝামেলা নেই, গামলার উপর ঝক্ ঝক্ করে চালগুলি।

উপর থেকে বউ-রাণী ডাকে মিনুকে।

মিনু ভাত বসিয়ে বৌ-রাণীর ঘরে যায়। টেবিলের উপর থেকে একটা মালিশের কৌটো নিয়ে আসে। রোজ এ সময় ওষুধটা বউ-রাণীর তলপেটে ঘসে ঘসে মালিশ করে ও গরম জলের সেঁক দিয়ে দিতে হয় ওকে। কিসের একটা ব্যথা জন্মেছে তার, ডাক্তার দিয়েছে ব্যবস্থা।

অনেক রাত করে ফিরে আসে শর্ব্বরী। পিনাকী ঘুমিয়ে পড়েছিল। লাইটের আলোতে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

শর্ব্বরী হাতের বড় ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে জামা-কাপড় ছাড়তে থাকে। আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে সে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকায়। আনন্দে দেহের মাঝে ছোট্ট একটু হিল্লোল তুলে এগিয়ে যায় স্নানাগার অভিমুখে।

পিনাকী চোখ মেলে নিঃশব্দে দেখছিল স্ত্রীকে।

বাথরুম থেকে ফিরে আসে শর্ব্বরী। লঘু প্রসাধন সমাপন করে আলো নিভিয়ে উঠে যায় শয্যায়।

সাবান, ক্রীম ও পাউডারের সুগন্ধ একটা মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করে। ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে পিনাকী স্ত্রীর একটা হাত চেপে ধরে।

—ও কি হচ্ছে? ঝাঁকুনি দিয়ে হাত সরিয়ে নিতে চায় শর্ব্বরী

ক্ষণিকের তবে পিনাকী থমকে যায়। যেন মরিয়া হয়ে সে বলে,

—এমনভাবেই কি আমাদের জীবন কাটবে শর্ব্বরী?

আর্ত হাহাকারের মত শোনায় পিনাকীর কথাগুলি

চুপ করে থাকে শর্ব্বরী। মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি তার মনেও নাড়া লাগে।

কেঁপে ওঠে পিনাকীর কণ্ঠ।...কথার উত্তর দাও···

বারান্দার ক্ষীণ আলো ঘরের মাঝে এসে পড়েছে। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে শর্ব্বরী তাকায় স্বামীর দিকে। অন্ধকারে আবছাগত তার অবয়ব দেখা যায়। আস্তে আস্তে সে বলে, আমাকে কি করতে হবে বলো?

বহুদিন বাদে আজ শর্ব্বরীর কণ্ঠ বড় মধুর শোনায় পিনাকীর কাছে। আনন্দে ওর সমস্ত অন্তরাত্মা নেচে ওঠে।

—আমি কি চাই তা তুমি জাননা লক্ষ্মীটি?

পিনাকী স্ত্রীর দেহ টানে নিজের বাহুবন্ধনীর মাঝে।

—বেশ' কি করবার করো। শর্ব্বরীর মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে। তার ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলি অন্ধকারে ঝিলিক্ দেয়।

পিনাকীর বাহুবন্ধনী শিথিল হয়ে যায়। স্ত্রীর আবেগহীন দেহ ছেড়ে দিয়ে রুদ্ধস্বরে সে বলে, শুধু এটুকুই কি তোমার কাছে আমার পাওনা?

জলে ওঠে শর্ব্বরীর দু'চোখ। দেহ নিয়ে তুষ্ট নয় লোকটা। রাগ

হয় তার। ওর কাছে সবচেয়ে প্রিয় তার নিজের সুশ্রী দেহবল্লরী। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নারীর সুন্দর সুশ্রী চেহারাকে ঘিরেই সংসারে সঞ্চারিত হয়েছে ও হচ্ছে যত প্রেম বা ভালবাসার কলগুঞ্জন। এ দেহকে হাতের মুঠোতে পেয়েও যে পুরুষ শুধু প্রলাপ বকে, তার সাথে মিল হতে পারেনা।

তা'ছাড়া মনের মাঝে ভাসছিল আজকের ক্লাবের নতুন পরিচিত সদস্য নবেন্দু সেনকে। সদ্য আমেরিকা থেকে এসে নেমেছে। প্রথম পরিচয়েই জন্মেছে একটা ঘনিষ্ঠতা। কল্পনায় স্বামীর মাধ্যমে নবেন্দুকে উপভোগ করতে চেয়েছিল সে।

কুঁচকে যায় শর্ব্বরীর কালো কাজল সরু জোড়া ভ্রূ। সে বলে, বড্ড পরিশ্রান্ত, ঘুমুতে দাও আমাকে।

ছোট্ট একটা হাই তুলে পিনাকীর দিকে পেছন ফিরে পাশ বালিশ আঁকড়ে শুয়ে পড়ে শর্ব্বরী।

আশা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ক্রোধে, ক্ষোভে শির্ শির করে পিনাকীর রক্ত। বিছানা ছেড়ে উঠে আসে ইজি-চেয়ারে।...

পরদিন দুপুরে ভাতের থালা সাজিয়ে মিনু দাদাবাবুর ঘরে এসে দাঁড়ায়।

প্রকাণ্ড ঘর, রদ্দুর আটকাবার জন্য অধিকাংশ দরজা-জানালা বন্ধ। দুপুরেও একটু আঁধার যেন নেমে এসেছে ঘরের মাঝে। দশটার ভেতর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বউ-রাণী বেরিয়ে গিয়েছে। পিনাকী আরাম-কেদারায় বসে ভ্রূ কুঁচ্‌কে কি যেন চিন্তা করছে।

কাল রাতে বউর কাছে প্রত্যাখাত হয়ে অবধি একটা পাগ্‌লা

চিন্তা ওকে পেয়ে বসেছে। অসংখ্য উদ্ভট্ কল্পনা এসে মাথার মাঝে ভিড় করেছে।...ছোটলোকদের মত শর্ব্বরীকে মারধোর করে দেখলে কেমন হয়···মদ খেয়ে সব ভুলে থাকাই বা মন্দ কি···ডাইভোর্স করা কিংবা বিবাগী হয়ে চলে যাওয়া! কোনটাই ঠিক পছন্দ হয় না পিনাকীর।

মিনুকে দেখার সাথেই তার চোখের দীপ্তি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

শর্ব্বরীর চোখের উপর ব্যভিচারের ঝড় বইয়ে দিয়ে দেখলে কেমন হয়? বিষে-বিষক্ষয়। নিশ্চযই শর্ব্বরী জব্দ হবে।

পিনাকীর দু'চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠে। মানুষের চোখে নিশাচর শ্বাপদের ভাষা—জানোয়ারের ক্ষুধা প্রকাশ পায়।

মাথা নীচু করে মিনু ভাতের থালা আসনের সুমুখে নামায়।

চেয়ার ছাড়ে না পিনাকী। সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে সে খুঁটে খুঁটে যাচাই করে স্বেদ-সিক্ত, আনতমুখী, স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী ঝি-টাকে।

ছাদ থেকে ঝুলান প্রকাণ্ড দু'ডানার পাখা নিঃশব্দে হাওয়া দিয়ে চলেছে। জানালার ছায়াটুকুতে বসে বিশ্রী কণ্ঠে একটা কাক ডাকছে। মিনুর রুক্ষ চুলের অলকগুচ্ছ হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে।

—কি খেতে বসতে বলছ না যে? হেসে মোলায়েম করে প্রশ্ন করে উঠে দাঁড়ায় পিনাকী। পার্স খুলে দশটাকার একটা নোট হাতে নেয়। তারপর আসনের উপর বসে ভাতগুলি নাড়াচাড়া করতে থাকে। হঠাৎ মুখ তুলে মিনুকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কে কে আছে?

দাদাবাবুর চোখের দৃষ্টি দেখে কেঁপে ওঠে মিনু।

—শোন! এ চাকুরী করে ক'দিন চলবে তোমাব? কিবা হবে এতে। বড্ড নোংরা হয়ে গিয়েছে তোমার কাপড়খানা। এই নাও!—এ টাকা দিয়ে একটা কাপড় কিনে নিও—

বন্ধ হাতের মুঠি খুলে পিনাকী দশটাকার নোটটা এগিয়ে দেয় মিনুর দিকে।

ভয়বিধুরা মিনু পিছিয়ে আসে কয়েক পা। দাদাবাবুও যে অমন করে এগিয়ে আসবে ভাবতে পারেনি সে। বলে, ওটাকায় আমার দরকার নেই, বাবু। আমাকে মাপ করুন, সঙ্গে সঙ্গে মিনু বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

রান্নাঘরে ফিরে এসে উনুনের পাশে টুলের উপর সে বসে পড়ে। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একটা বিবশতা ওকে স্তব্ধ করে রাখে। দু'চোখ দিয়ে কিছুক্ষণ জল গড়িয়ে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে একটা দ্বন্দ্ব ওকে ভাবিয়ে তোলে। এখান থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ নিলেই যে স্নেহাই পাওয়া যাবে, সে আশা আজ আর ওর নেই। একবার মনে হয় দাদাবাবু মন্দ নয়। পরক্ষণেই প্রভেদটা গুলিয়ে যায়। ছাই ঢাকা উনুনের গহ্বরের দিকে চেয়ে দু'চোখ জালা করে। চারিদিকে যে শুধু অন্ধকার।

ধীরে ধীরে যুক্তি এসে দেখা দেয়।

পরের বাড়ী রোজগার করে খেতে হলে কিছুটা সহ্য করতেই হবে।

রাত্তিরে বাড়ীতে ফিরে এসে কিন্তু দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না মিনু। একটা অস্থিরতার জ্বালায় ভেতরটা ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

নিঃশব্দে পাশে শুয়ে আছে রবি। সমস্ত রাতের মাঝে সে এক ঘণ্টা ঘুমোয় কিনা সন্দেহ। আজ বলে নয়, এমনি চলে আসছে অসুখের পর থেকে। কত রাতে উস্‌খুস করে মিনু শেষের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে, কত রাতে সে বৃথাই জাগিয়েছে ওকে। কোন ফল হয়নি, বরং রাত জাগার ফলে পরের দিনটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

পাশ ফিরে রবি। একটু বোধহয় ঘুমিয়েছে সে। তার একটা হাত মিনুর বুকের উপর আছড়িয়ে পড়ে। নিজের সুডৌল দু'হাত দিয়ে মিনু স্বামীর হাতটি চেপে ধরে। কত রোগা হয়ে গিয়েছে ওর আঙুলগুলি।

যৌবনে পরিপূর্ণ, লোভাতুর, ভয়াবহ কিন্তু সুন্দর দাদাবাবুর ধবধবে আঙুলগুলি চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে।

চমকে যায় মিনু। এসব কি চিন্তা করছে সে? রুদ্ধ আবেগে মিনু রবির ঘুমন্ত দেহ জড়িয়ে ধরে।

রবির তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। হাঁপিয়ে সে বলে, আঃ! ছেড়ে দাও মিনু। দম যে আটকে যাচ্ছে।

মিনু সরে আসে একপাশে।

রবি উঠে ডানহাত দিয়ে বুকের পাঁজরগুলি টিপতে থাকে। মাথা হেঁট করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর স্ত্রীর দিকে পেছন দিয়ে শুয়ে পড়ে।

দীর্ঘশ্বাস চেপে নেয় মিনু।

ভাঙ্গা দেয়ালের গা বেয়ে একটা ধেনো ইঁদুর বেয়ে উঠছে উপরে বিছানার পাশ দিয়ে দৌড়ে যায় একটা ছুঁচো। বিশ্রী গন্ধে ভরে যায় চারপাশ। ঘরের কোনে ভাতের হাঁড়িতে কুটকুট করে শব্দ হচ্ছে।

দূরের একটা পেটা ঘড়িতে রাত তিনটে বাজার ঘণ্টা শোনা যায়।

রবি শুয়ে আছে নিঃসাড়ে। নস্ত ঘুমঘোরে কিছুক্ষণ আবোল তাবোল বলে এইমাত্র চুপ করেছে।

ঝাপ খুলে মিনু বাইরের রোয়াকে এসে বসে।

ফুটফুটে চাঁদের আলোতে ভরে আছে চারিদিক। ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথার ভার অনেক কমে আসে। খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে মিনু চোখ বোজে

কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে থেকে ওর অবাধ্য মন পাড়ি জমায় অতীত জীবন পাতায়। হারিয়ে যাওয়া একটা আবছা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি বার বার ভেসে ওঠে ওর বন্ধ করা চোখের সুমুখে। সে সবল মূর্ত্তিকে ঘিরে ওর দুঃখ আশ্রয় খোঁজে। মনকে সান্ত্বনা দেয় অতীতের সুখস্মৃতি স্মরণ করে।

কিন্তু এ জোড়াতালির যে জোর হয় না। ছিঁড়ে যায় কল্পনার রাশ।

এ রকম ফুরিয়ে যাওয়া একটি পুরুষ কি সে চেয়েছিল? রবি যে এত সকালে এমনি করে ফুরিয়ে যাবে, কখন কি কল্পনা করতে পেরেছিল।

পূর্ব্বে এ প্রশ্নটা এত বড় হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু আজ রাত্রির অন্ধকারে কিছুতেই সে এ প্রশ্ন এড়াতে পারে না।

যে জন্ম চাকুরী নেওয়া তার যে কিছুই হোল না। ওর স্বাস্থ্য যে দিনের পর দিন ভেঙ্গেই যাচ্ছে। স্বাস্থ্য যে একটুও ফিরল না?

আজকাল মিনু পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে ভয় পায় স্বামীর দিকে। যখন তার হাড় বের করা শীর্ণ বুক নিঃশ্বাসের টানে বার বার ফুলে ওঠে, তখন বড় বীভৎস দেখায় সে বক্ষ-পঞ্জরের নাচন। রবির ফোলা ফোলা রক্তহীন পাণ্ডুর হল্‌দে মুখ, কঙ্কালের মত দেহ ঘিরে সর্ব্বদা হাহাকার মূর্ত্ত হয়ে ফিরে। স্বামীর জন্য হয় সে দুঃখিত, নিজের জন্য হয় সে আতঙ্কিত।

এ সব ব্যাপার চিন্তা করতে চায় না মিনু। ভয় করে সে এ চিন্তার ধারাকে। খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে একটু ঘুমুতে চায় সে। বদ্ধপাতার আবরণে চোখের দৃষ্টি তার শাসন মানে না। মিনু জেগে থাকে একরাশ চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষায়।

১১

শেষ পর্য্যন্ত মৃগাঙ্ককেও ছেড়ে আসতে হয়েছে মায়ার। সেদিনের সে মূর্খামির কথা মনে হলে এখনও ওর গা জ্বালা করে।

সম্পাদকের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে কত না আশা নিয়ে ঘর বেঁধেছিল সে। মৃগাঙ্কও উদার করে ভালবেসেছিল তাকে। মায়ার স্মৃতিতে সে দিনগুলি অম্লান হয়ে থাকবে চিরকাল। আজও ওর ভাল লাগে সে দিন ক'টির কথা ভাবতে। ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে মৃগাঙ্ক কত কি যে বলতো, মায়া তার কিছুই বুঝতে পারতোনা। কিন্তু মৃগাঙ্কের মুখের দিকে চেয়ে অনেকটাই তার জানা হয়ে যেত।

বেশ সুখেই কাটছিল তাদের দিন। মৃগাঙ্ক বলেনি তার মা ভাই-বোনদের কথা। মায়াকে নিয়ে ঘর বেঁধে মৃগাঙ্ক বন্ধ করে দিয়েছিল তাদের টাকা। অপিসে খোঁজ নিয়ে হঠাৎ একদিন ওরা এসে উঠল মায়ার সংসারে। মায়াকে দেখে ওরা অবাক হ'ল বটে, কিন্তু এ নিয়ে হৈ চৈ করল না একটুও, বরং মায়াকে ওরা তোষামোদই করা আরম্ভ করল।

যতই দিন এগিয়ে চলে, এ নতুন পরিবেশে হাঁপিয়ে ওঠে মায়া। মৃগাঙ্কের মা যখন ওর হাত ধরে কেঁদে কেঁদে বলেন নানা দুঃখের কথা তখন কি এক অজানিত ভয়ে বুকের মাঝটা কেঁপে ওঠে মায়ার। তাদের আসার পর থেকে মৃগাঙ্কও কেমন যেন আনমনা হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত

হয়ে সে অহেতুক মা-ভাই-বোনদের গালাগাল করে। ভয়ে তারা মায়াকে তোষামোদে অস্থির করে তোলে। মৃগাঙ্কের ক্রোধ যেন মায়ার তুষ্টিতেই বিলীন হয়ে যাবে।

মায়া পালিয়ে বাঁচল এ অসহ অবস্থার হাত থেকে। তারপর কত লোকের কাছে সে গেল, কত সংসার বাঁধল, কত ভাঙ্‌লো—তা গুণে রাখেনি। আজ সে শ্রান্ত, খোঁজে বিশ্রাম। তাই বোধহয় ছগনলাল ঝুন্‌ঝুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেছে নিবিড় হয়ে।

মায়ার কাছে মুছে গিয়েছিল রবি। যেমনি করে মুছে গিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে চলে আসার পর। কয়েকদিন আগে রবিকে শীর্ণদেহে কালীঝুলি মাখা জামা গায়ে অদূরের লোহার কারখানায় কাজে ঢুকতে দেখে চম্‌কে যায় সে। কিন্তু সুখে গর্ব্বিতা দেহ বিলাসীনির কাছে সে চমক্ ক্ষণেকের তরে।

বহুদিন যাবৎ মায়ার একটা রেডিওর সখ। এবার মহাবীরের জন্ম-উৎসবে ছগনলাল একটা দামী রেডিও সেট উপহার দিয়েছে মায়াকে। মায়ার আনন্দ আর ধরেনা। চাবি টিপে সময়ে অসময়ে দেশ-বিদেশের বোধ্য-অবোধ্য গান বাজনা শোনে। এমনকি কয়েকটা গানের প্রথম লাইনের সুর পর্য্যন্ত রপ্ত হয়ে এসেছে। যখন তখন সে আজকাল সুর ভাঁজে।

সেদিন দুপুরের হাল্কা ঘুম থেকে উঠে মায়া বারান্দায় এসে বসে। এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে ধীরে, ফুটপাথের উপর দিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে চলেছে পথিকরা। ভেজা রাস্তার উপর দিয়ে অদ্ভুত ছর ছর শব্দ করে গাড়ীগুলি চলেছে ছুটে। দ্রুত ধাবমান গাড়ীগুলি দেখতে বেশ লাগে।

চলমান ট্রাম ও বাসের মাঝ দিয়ে একটা জীপ দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায়। মায়া ভাবে, জীপটা যদি ট্রাম ও বাসের মাঝে পড়ে চেপ্টা হয়ে যেত তা'হলে জীপের ঐ ফুরফুরে বাবু কয়টির রগড় করা বেরিয়ে যেত জন্মের মত। মায়ার রাগ হয় ঐ বে-আক্কেলে লোকগুলির উপর। কেন বাপু অত জোরে গাড়ী চালান, অত বাহাদুরী দেখান। হেঁটে ত আর যেতে হচ্ছেনা। ছুটেই ত যাচ্ছ, তবু কেন এরকম ছুট দেবার ইচ্ছা।

ঘুরে ঘুরে মায়ার চোখ গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ায় রবির কারখানায় উপর।

বারান্দাব উপব বসে রবি একটা ঠোঙ্গা থেকে মুড়ি খাচ্ছে একটু একটু করে। কি যেন চিন্তা করছে সে। খাওয়ার চেয়ে চিন্তাটা বড়, তাই মুড়িগুলি কমছে অতি ধীরে।

আজ মায়া চোখ ফিরিয়ে নিতে পারেনা চট্ করে। রবির ঐ ভাঙ্গা স্বাস্থ্য, চিন্তাকুল মুখচ্ছবির দিকে তাকিযে ওর মনটা একটু মোচড় দিয়ে ওঠে :

অজান্তে মায়ার চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে মালকোচা দিয়ে কাপড়-পরা, মাথায় গামছা বাঁধা, যৌবনের জোয়ারে ভরপুর তেল চিক্‌চিকে স্বাস্থ্যবান একটি গ্রাম্য যুবকের ছবি। বাপের পাশে বসে ভুরুক ভুরুক করে তামাকটানা এবং আঁড়চোখে ক্ষেন্তিব দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসা—

ক্ষণিকের তরে আন্‌মনা হয়ে যায় মায়া। কত কথা আজ মনে ভাসে। নিজদের নিরিবিলি ছোট্ট বাড়ীখানি, মিত্তিরদের আমবাগান। বোসদের দীঘি, চাটুর্য্যেদের পুজোমণ্ডপ। সদা হাস্য মুখ ছোট ভাইটি। ম্যালেরিয়ায় ফ্যাকাশে মা। খুট্ খুট্ করে তার সমস্তদিন সংসারের কাজ করা। বাপের প্রাণখোলা প্রচণ্ড হাসি···

মায়ার দু'চোখ ঝাপ্সা হয়ে আসে।

কিছুক্ষণ কেটে যায়। মায়া আবার তাকায় রবির দিকে।

দরজার কাছে একটা লেদের উপর ঝুঁকে কাজ করছে রবি। একটু বেশীই যেন ঝুঁকে গিয়েছে মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছে নিচ্ছে উঁচু হয়ে। বড় পাণ্ডুর—বড় শীর্ণ দেখাচ্ছে ওকে।

কি করে ওর অমন স্বাস্থ্যটা ভেঙ্গে গেল। কেনই বা অবনীর কারখানা থেকে কাজ গেল। দেশে ফিরে না গিয়ে কেন এখানে পড়ে এমন করে খাটছে। সংসার করেছে কিনা। মায়ার মনে নানা প্রশ্ন এসে ভিড় করে।

হঠাৎ চমকে ওঠে মায়া। এ সব কি চিন্তা করছে সে? নোলক্-পড়া গেঁয়ো ক্ষেন্তি···নোংরা শক্ত তার বিছানা—কদর্য্য পানায় ভরা পুকুরের জল,···মাল্‌সাভরা পান্তা খেয়ে ঢেঁকুর তোলা—ধান সেদ্ধ করা ও ঢেঁকী চালান।—এযে এখন মনে করাও দুঃসহ! হাড় সর্ব্বস্ব ফুরিয়ে যাওয়া ঐ লোকটাকে দেখে কেন সে ভাবছে এ সব কথা?

নিজের উপর রাগ হয় মায়ার। বারান্দা ছেড়ে সে ফিরে আসে ঘরে। রেডিও ছেড়ে দেয়, মনোযোগ দিয়ে শোনে গান। মাথার উপর পাখাটা গোঁ গোঁ ডাক ছাড়ে। নরম পালকের মত বিছানাটা যেন হাত বুলিয়ে দেয় সর্ব্বাঙ্গে। মধুর আমেজে চোখদুটা বুজে আসে।

ধীরে ধীরে সূর্য্য হেলে যায় পশ্চিমে। ছগনলালের আসার সময় হয়েছে।

প্রসাধন করতে বসে আজ মায়া একটু বেশী করেই স্নো-পাউডার ঘসে মুখে। আলমারী খুলে সবচেয়ে দামী শাড়ীটা জড়িয়ে নেয় দেহে।

ছগনলাল এসে মুখ গোমরা করে বসে থাকে। মনটা ওর কয়েক দিন যাবৎ ভাল নয়। গোটা সর্ষের দর অনেক নেমে গেছে। শেয়াল

কাঁটার বীজ মিশিয়ে পরতা থাকছেনা। ভেজাল না দিয়েই সর্ষের তেল ছাড়তে হচ্ছে বাজারে। গোলমরিচের সাথে পাকা পেঁপে বীজ শুকিয়ে মেশান চলছিল কয়েকদিন যাবৎ। এ বছর আশানোরূপ পেঁপের বীজ সংগ্রহ করতে পাচ্ছেনা এজেণ্টরা। ফলে ভেজালহীন গোলমরিচ চালান যাচ্ছে বাজারে। নারকেল তেলের দরও হু হু করে নেবে যাচ্ছে। হোয়াইট-অয়েল যে আর ক'দিন মেশান চলবে কে জানে? ওষুধের বাজারটাও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। নকল ওষুধ খেয়ে রোগী মারা যাওয়ায় এখন সোজা কোম্পানী থেকে ওষুধ নিচ্ছে ওষুধের দোকানের মালিকরা, তার উপর গভমেণ্টের চরগুলির লোভ বেড়ে গেছে পেয়ে পেয়ে, এখন আর অল্পে তুষ্ট করা যায়না তাদের। ছগন-লালের ভাল লাগেনা এসব।

পরশু ঘনশ্যাম শেঠজীর বাড়ীতে একটা মিটিং হয়ে গেছে। আমেরিকান সাহেবটা ত খারাপ কথা কিছু বলেনি। মুদিগিরি বন্ধ করে কারখানা চালু করতে বলেছে সে। তার দেশ নাকি সাহায্য করবে সব দিক দিয়ে।

ছগনলাল ভাবে কথাগুলি। হাজার হাজার লোক খাটবে, গভমেণ্ট দলে থাকবে। আঃ—কি আরাম! বিড়লাজী যে ও পথই ধরেছে। কি প্রতাপ বিড়লাজীর। নেহেরুজীকে যারা জানে—বিড়লাজীকেও তারা চেনে।

সম্ভ্রমে দু'হাত কপালে ঠেকায় ছগনলাল। কি সুন্দর লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরটাই না বিড়লাজী গড়েছেন। কত দান... কত ধ্যান! হ্যাঃ...আত্মা আছে বটে। মানুষের মত মানুষ।

এক কাপ চা ও কিছু মিষ্টি এনে মায়া ধরে ছগনলালের সুমুখে।

একটা দরবেশ মুখে দিয়ে ছগনলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—বুঝলে মায়া! বিড়লাজীকে একদম দেখতে পারেনা তোমার বাঙ্গালীরা। কত ইস্কুল, কত হাসপাতাল করে দিয়েছেন বাংলায়। তবু তাকে খারাপ বলে, এ নিমকহারামী বড় খারাপ, বড় আপসোসের বাৎ··

মায়া ছগনলালের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, কে কাকে ভালবাসে সে আমি জানিনে বাপু। তবে আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি কিন্তু···

ছগনলালের মুখ খুশীতে ভরে যায়।

—হা...হা···সে ত বটেই...বটেই...

মায়া অরেকটা দরবেশ গুঁজে দেয় ছগনলালের মুখগহ্বরে।

দো-পেঁয়াজি মেটে খেতে ভালবাসে মায়া। সেদিন ছগনলাল প্রসিদ্ধ এক রসুইগার থেকে নিয়ে এল এক প্লেট। কিন্তু আজ মায়ার কাছে এ লাগে বিস্বাদ।

দুপুরের দৃশ্যটা কিছুতেই সে ভুলতে পারেনা। টিফিনে রবি দু'পয়সার মুড়ি কিনে বসেছিল রকের উপর। প্রথম মুঠি মুখে তোলবার সাথেই আকাশ থেকে একটা চিল ঝাপিয়ে পড়ে সব ছত্রখান্ করে দেয়। ফুটপাথের উপর ছড়ানো মুড়িগুলির দিকে তাকিয়ে রবি বসে থাকে অনেকক্ষণ।

খেতে বসে মায়ার চোখে সে দৃশ্য ভাসে বার বার। খাওয়া আর হয়না। সুস্বাদু প্লেট পড়ে থাকে।

মায়া আরও লক্ষ্য করে, মুড়ি খাওয়াও নিয়মিত নয় রবির। বহুদিন সে মুড়িওয়ালার কাছে গিয়ে ফিরে আসে। পকেট থেকে বের করা পয়সা পকেটেই রেখে দেয়।

দিনের পর দিন মায়ার মনের মাঝে সমবেদনা ও সহানুভূতি একটু একটু করে দানা বেঁধে ওঠে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রবিকে দেখা এবং কল্পনার জাল বোনা যেন মায়াকে গ্রাস করে নিচ্ছে।

এমনধারা ভাবনা এর আগে মায়ার মনে কখন বাসা বাঁধেনি। পুরুষের জন্য চিন্তা করা…ভালবাসা…এ ক'বছরে বহু পুরুষের নিষ্পেষণে নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছিল। রবিকে দেখে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ পায় সে কোমলতাটুকু। মায়া অনুভব করে…ভাবে…ভাল লাগে।

মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে মায়া। কারখানার দিকের দরজা-জানালা রাখে বন্ধ। ছগনলালকে নিয়ে মেতে ওঠে।

দু'দিন, চার দিন কাটে বেশ। হঠাৎ হয়ত দৃষ্টি পড়ল রবির উপর। সব তালগোল পাকিয়ে গেল।

এক এক সময় ওর ইচ্ছা হয় স্নেহ ও মমতার দাবী নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু রবির সেদিনকার দু'চোখের ঘৃণা যে এখনও সে ভুলতে পারেনি। যদি সে অমনি করেই তাকায়, অমনি করেই ফিরিয়ে দেয়! তা'হলে—

মায়া আর ভাবতে পারেনা।

১২

সামান্য বেতনে ছোট্ট একটা লেদ্ কারখানায় কয়েকদিনের জন্য কাজ হয়েছে রবির। হোক অস্থায়ী তবু হাঁফ ছাড়ার প্রয়াস খোঁজে সে।

ব্যায়রামের পর বিশ্রাম নেই। পরিশ্রমে নেই উপযুক্ত খাদ্য। মনে নেই স্বস্তি। আজকাল ওর পক্ষে ক্ষয়ে যাওয়া শরীর নিয়ে এক নাগাড়ে আট ঘণ্টা পরিশ্রম করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। প্রথম চার ঘণ্টার পর ঝিমিয়ে পড়ে মাংসপেশীর প্রতিটি তন্ত্রী। টিফিনের পর ক্ষণিকের তরে সামান্য একটু সজীবতা ফিরে আসে। পরবর্ত্তী সময়ে দম একদম ফুরিয়ে যায়। তার উপর নতুন একটা উপসর্গ এসে জুটেছে। পেটের উপর দিকে খাবার পর লাফিয়ে ওঠে একটা ব্যথা।

দু'জনে আয় করছে। রবির চিন্তা কমবার এবং স্বাস্থ্য সারবার কথা। কিন্তু দিনের পর দিন ওর স্বাস্থ্য ভেঙ্গেই যাচ্ছে।

মিনুর পরের বাড়ী কাজ করাটাকে কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনা রবি।

সহকর্ম্মী বিনয়ের বউ দাসীবৃত্তি করছে বহুদিন থেকে। তার বাড়ী গিয়েছে রবি বারকয়েক। বউটার সাজসজ্জা, আদব-কায়দা, মোটেই তার পছন্দ হয়নি। বিনয়কে একদিন সে প্রশ্ন করেছিল। মুখ কালো করে বিনয় যা উত্তর দিয়েছিল, তা সুবিধের নয়।

বউ কাজ নেবার পর থেকে শাড়ী, তেল, সাবান কিনে দিতে হয়না বিনয়কে। প্রয়োজনমত বউ সে সব যোগাড় করে নিয়ে আসে।

তা'ছাড়া মাথার গন্ধতেল, গায়ে সাবান নইলে এখন তার চলেনা। বিনয়ের সাধ্য নেই এ সব যুগিয়ে দেওয়া।

বিনয়ের সেই খ্যাঁদানাক বউর কথা ভেবে মিনুর দিকে তাকালেই রবির বুকের ভেতরটা হু হু করে। কিন্তু সর্ব্বদা মনে মনে একটা দুর্ব্বলতা বোধ করে রবি। অকালে ফুরিয়ে যাওয়া যৌবনের কঙ্কাল বয়ে বেড়াতে হচ্ছে তাকে। পরিপূর্ণ দেহা স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে ওর দৃষ্টি ব্যথিত হয়ে ওঠে। স্বীয় অধিকারের কথা মনের মাঝে নিয়ে গুমরে গুমরে মরে। অথচ কাজ ছেড়ে চলে আসতে মিনুকে বলতেও সে পারেনা।

সেদিন রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে রবি ভাবছিল নিজের অক্ষমতারই কথা।

স্ত্রী আজ পরগৃহে পালিত। ছেলেমেয়ে দুটি জীবনের সব রকম সুখ-সমৃদ্ধ থেকে বঞ্চিত। কতই না ইচ্ছা ছিল নন্তুকে ইস্কুলে পড়িয়ে মানুষ করে তোলার। কুলির ছেলে যে কুলিই থাকবে, এ-ত চায়নি সে। আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। অপুষ্ট খাদ্য খেয়ে কুলির দৈহিক যোগ্যতাও যে হারাতে বসেছে। রাস্তার ভিক্ষুক জীবনের ভবিষ্যৎ ছাড়া যে ওদের আর কিছুই থাকবে না।

রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে কখন যে রবি এসে পড়েছে আশু-ডাক্তারের চেম্বারের কাছে খেয়াল নেই, থমকে দাঁড়ায় সে। একটু ইতস্ততঃ করে পা বাড়ায়।

রবির নিষ্প্রভ ঘর্ম্মাক্ত মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তার চম্‌কে যায়। একটা টুলে বসে রবি এগিয়ে দেয় তার হাত।

খুঁটে খুঁটে ডাক্তার জেনে নেয় অনেক কিছু। বহুক্ষণ ধরে রবির

বুক-পেট পরীক্ষা করে বলে, ওষুধপত্রের চেয়ে একনাগাড়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া অত্যন্ত দরকার। আর পেটের ব্যথার জন্য যে খাবারের প্রয়োজন, তা তুমি কোত্থেকে পাবে? তবে সবাইর আগে বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

—বিশ্রাম নিতে গেলে কাজ থাকবেনা বাবু। এর ভেতরই একটা ব্যবস্থা করুন—

—হুঁ…'আল্‌সার', এখনও হয়নি তাই নড়ে চড়ে খাচ্ছ। কিন্তু এভাবে চল্লে আর ক'দিন? বেশ ওষুধ চাইছ নিয়ে যেও…

বাইরে এসে রবির হাসি পায়। বিশ্রাম!...গরীবের বিশ্রাম? অনেকদিন আগে শোনা যোগেশদার একটা কথা মনে হয়। গরীবের বিশ্রাম মিলে মৃত্যুর পর। কাজের ফাঁকে যেটুকু অবসর, সেটুকু হচ্ছে যন্ত্রকে সচল রাখার কারসাজি।

রাস্তার পাশে তাড়ির দোকানে হুল্লোড় আরম্ভ হয়েছে। রবি কাজ থেকে ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরছিল। থম্‌কে দাঁড়ায় সে। ঐ এক ভাঁড় টেনে নিলেই নাকি সব যন্ত্রণা ভুলে থাকা যায়।

রবি পকেটে হাত দেয়। একটা আধুলি ঠেকে আঙুলের ডগায়।

মনের মাঝে ওঠে ঝড়। মাতাল…শেষে মাতাল হয়ে গড়াতে হবে রাস্তার ড্রেনে, কুকুরে চেটে যাবে মুখ! লোকেরা ঘৃণায় দেবে থুথু! ছ্যাঃ…রবি পা বাড়ায়।

ঘরের মাঝ থেকে বিহ্বল আনন্দ-চিৎকার ভেসে আসে। প্রাণ-খোলা উচ্চহাসি হেসে ওঠে একটা লোক। রবি এগিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে। কতদিন যাবৎ সে হাসেনা। হাসি বোধহয় ভুলেই

গিয়েছে সে। ঘরের মাঝে যে লোকটা হাসল, রবির হিংসা হয় তার উপর।

সব দলিয়ে মাড়িয়ে রবি এগোয় দোকানের দিকে। অসহ্য দুর্গন্ধ ঘরের ভেতর, দৃক্‌পাত করতে চায়না রবি; নাকে কাপড় গুঁজে এক ভাঁড় তাড়ি ঢেলে দেয় গলার মাঝে।...আরও এক ভাঁড়।

দুর্বল শরীরে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে। দুনিয়া যেন উল্টে যাচ্ছে। স্বচ্ছ দিনের আকাশ রক্তরাঙ্গা। কিন্তু কৈ...কোথায়?—কোথায় দুঃখ ভুলে যাবার পথ। চারপাশ থেকে যে দুঃখের বোঝা শতগুণ হয়ে চেপেছে মাথার উপর। অসহ্য!...একি সে ভুল করল। চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে, কান্না যে ঠেলে উঠছে। শুধু কান্না...চারপাশে যে কেবলীই কান্না। পা দুটি কাঁপছে, দাঁড়াতে পারেনা রবি। দেয়ালে ঠেশ দিয়ে মেঝের উপর বসে পড়ে। দুঃখে ও শোকে চারপাশের যে সবাই কাঁদছে, এর মাঝে কি চুপ করে থাকতে পারে সে। হাঁউ হাঁউ করে কান্নায় ফেটে পড়ে রবি। অদ্ভুতভাবে গোঙিয়ে গোঙিয়ে সে কাদে; বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। নন্তু মরে গিয়েছে...মিনু মরে গিয়েছে...ক্ষেন্তি মরে গিযেছে...দুনিযার সব মরে গিয়েছে...চারিদিকে কেবল ধূয়ো...কালো কালো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে সে ধূয়ো। রবি হাতড়ায়, পেতে চায় মৃতদেহগুলি। কিন্তু পুড়ে যে সব ছাই হয়ে গেছে। হিঃ...হিঃ...হিঃ...রবি হাসে। দুলে দুলে হাসে। হাসিতে ফেটে পড়তে চায় সে। একটু আগেকার কান্নায়-ভেজা দু'চোখ ওর জ্বল্ জ্বল্ করে। কোথায় যেন সে শুনেছে, এ্যাটম বোমায় পোড়া ছাইতে গাছ লাগালে 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি হয়।' না, সে কাঁকুড়গাছ লাগাবে না—লাগাবে একটা টাকার গাছ। কিন্তু

টাকা দিয়ে কি হবে ? সবাই যে মরে গিয়েছে ! আবার কান্নায় ফেটে পড়ে রবি।

পাশের একটা মাতাল রবির মুখের সুমুখে তুলে ধরে তার ভাঁড়ের নীচে পড়ে থাকা একটু তাড়ি। রবি ওটুকু টেনে নিতেই গল্ গল্ করে বেরিয়ে আসে বমি। তাড়ির দোকানদার গালাগালি করে রবিকে ঘরের বাইরে সরু রকের উপর বসিয়ে দেয়।

বড্ড ঘুম পাচ্ছে।...রবি এলিয়ে দেয় দেহ। দু'চোখে নামে রাজ্যের ঘুম।

চারটি লেদ্ নিয়ে রবিদের লেদ্ কারখানা। মালিক নটবর দাস লোক মন্দ নয়। অত্যন্ত ছোট অবস্থা থেকে বড় হয়েছে যুদ্ধের দৌলতে।

পনের বছর আগে সামান্য লেদ্-মিস্ত্রীর কাজ করত সে। যুদ্ধের ফাঁপানো বাজারে স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়ে একটা পুরোনো লেদ্ নিয়ে কারবার চালু করে। আজ দশ বছরের ব্যবধানে কলকাতার দু'খানা বাড়ীর মালিক সে। তার কারখানায় এখন পঁচিশ জন লোক কাজ করে।

প্রকাণ্ড একখানা অন্ধকারময় স্যাঁৎস্যাঁতে ঘর ভাড়া নিয়ে কারখানা। লোহালক্কর বোঝাই একটা ঘরের কোণে কাঠের পার্টিশান দিয়ে তৈরী করা অফিসঘর। নটবর দাস তার ছোট্ট কালো রংয়ের গাড়ীতে চেপে রোজ সকাল আটটায় অফিসে আসে এবং রাত দশটায় কারখানা বন্ধ করে বাড়ী ফিরে যায়।

রবির শরীরটা সেদিন ভাল ছিল না। সারারাত ঘুম হয়নি পেটের ব্যথার যন্ত্রণায়। অসহ্য হয়ে ওঠেনি, তাই সে কাজ করে চলে।

তিন টন পুরোনো নাট-বল্টুর প্যাচ কেটে দিতে হবে চারদিনের মাঝে। নগদ টাকা ; পার্টি বড় ; ভবিষ্যতে আরও কাজ পাবার আশা আছে।

কারখানার চারটি লেদ্ পুরোদমে কাজ দিয়ে চলেছে। নটবর দাস অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে কারখানার মাঝে ঘোরাফেরা কচ্ছে। শ্রমিকরা 'না-থেমে' কাজ দিচ্ছে। প্রত্যেকের পায়ের কাছে প্যাচ্ কাটা নাট-বল্টুর স্তূপ জমে উঠছে।

ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলেছে রবি। মালিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি যাতে কোন খুঁৎ ধরতে না পারে তার চেষ্টা করে সে।

গায়ের জামা ভিজে গিয়েছে। নাসারন্ধ্র স্ফীত। বড় বড় নিঃশ্বাস টেনে রবি কাজ করে চলে।

দুর্ব্বল শরীরে বেশীক্ষণ পাল্লা দেওয়া চলেনা। শিথিল হয়ে আসে ওর মাংসপেশীর শক্তি। যতই সময় এগিয়ে যায়, ততই হাতের চাপের জোর কমতে থাকে।

প্যাচ্কলের ইস্পাতের দাঁত পিছ্লে যায় নাটের গায়ের উপর দিয়ে। দাঁতে দাঁত চাপে রবি। শীর্ণ হাতের শুষ্ক শিরা ফুলে ওঠে। মাথা গরম হয়ে যায়, পারেনা সে। ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ে অন্যান্যদের চেয়ে।

একটা নাট তুলে প্রাণপণ শক্তিতে রবি চেপে ধরে ডাইসের মুখে। পিছ্লে যায় ডাইস, ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে নাট। নাটটা মাটি থেকে তুলে আবার ডাইসের মুখে চেপে ধরে সে।

পাশ দিয়ে ঘুরে যায় নটবর দাস।

টিফিনের পর রবি আর পারেনা কাজে যোগ দিতে। পেটের ব্যথাটা যেন সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে।

নটবর দাসের দৃষ্টি এড়ায়না। কয়েকদিন যাবৎ সে লক্ষ্য করছে রবির কার্য্যকলাপ। খরচের খাতায় নাম লেখান শ্রমিকটিকে রাখা অর্থহীন। রবির পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে বলি বলি করেও সে ইতস্তত: করছিল। নিজের অতীত জীবনের দিনগুলির কথা এখনও পুরোপুরি ভুলতে পারেনি। কিন্তু আজ রবিকে ডেকে পাঠায় সে। আশঙ্কায় রবির বুক কেঁপে ওঠে।

এক মাসের বেতন দিয়ে নটবর দাস বলে, স্বাস্থ্য ফিরিয়ে এসোগে মিস্ত্রী। কাজকর্ম্মও তেমন নেই—মানে, একটা লেদ্ বন্ধ রাখব ঠিক করেছি।

রবির দু'চখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বুকের ঠিক নীচটায় যন্ত্রণাটা যেন ঠেলে ঠেলে ওঠে। অতি কষ্টে বাড়ী এসে দাওয়ার উপর সে শুয়ে পড়ে।

মিনু গিয়েছে মনিব বাড়ী। নন্তু বাপের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট মুখ দেখে ভয় পেয়ে যায়। একটা ভাঙ্গা হাতপাখা দিয়ে সে প্রাণপণে বাপের মাথায় হাওয়া করতে থাকে।

চোখ বুজে পড়ে আছে রবি। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় কেঁকিয়ে কুঁকড়ে যায় তার দেহ। হঠাৎ অব্যক্ত যন্ত্রণায় ধনুকের মত বেঁকে যায় রবি। কিছুক্ষণ এমনি থেকে পুনরায় সোজা হয়। সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে থর থর করে।

ভয় পেয়ে নন্তু ছোটে মার খোঁজে বড়-বাড়ী মুখো।

হন্ হন্ করে নন্তু চলছিল পথ দিয়ে। উল্টো পা-পথে মাকে দেখে সে চিৎকার করে ডাকে। মিনু খেয়াল করেনা।

রাস্তা পার হবার জন্য পা-পথ ছেড়ে নন্তু নীচে নামে। মটোরের সারি চলেছে পথ জুড়ে। নন্তুর একটু দেরী হয়, ততক্ষণে মিনু এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা। সুমুখের চলমান মানুষের ফাঁক দিয়ে নন্তু মাকে প্রথম দেখতে পায়না। এগিয়ে গিয়ে সে খুঁজতে থাকে।

মিনু ডানহাতি বাঁক নেয়। তার অতি পরিচিত নোংরা হলদে রংয়ের শাড়ী দেখতে পেয়ে নন্তু ছোট্ট একটু দৌড় দিয়ে তাকে ধরে ফেলে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছেলের মুখে সব শুনে ভয়ে মিনুর অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। একটা অ'কেজো গ্যাস্‌পোষ্টের গায়ে ঠেস্ দিয়ে সে শরীরের ভার রক্ষা করে।

পথচারীদের নানাভাবের দৃষ্টিপাত হতে থাকে মিনুর দেহ ঘিরে। দু'একজন অতি উৎসাহী ব্যক্তি এসে নন্তুকে প্রশ্ন আরম্ভ করে।

নন্তুর একটা হাত ধরে সুমুখের দিকে পা-বাড়ায় মিনু।

বাড়ীর দাওয়ায় পা রেখে মিনু থম্‌কে যায়। টোকো গন্ধে ভরে আছে ঘর। কিছুটা বমি করে রবি পড়ে আছে নিঃসাড়ে। তার দু'কষে মাছি ভন্ ভন্ করছে। ছোট মেয়েটা একটা কাঠি দিয়ে বাপের বমি ঘাঁটছে খেলাচ্ছলে। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে মাছি ধরার চেষ্টা করছে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে।

একটা বিভৎস পাণ্ডুর ছায়া ছড়িয়ে আছে রবির হলদে মুখের উপর। তাকিয়ে মিনু ভয়ে আঁৎকে ওঠে।

নন্তু ছোট বোনকে কোলে তুলে নেয়।

নতুন মানুষের আগমনে মাছির ঝাঁক্ বিরক্ত হয়ে রবির মুখ ছেড়ে এদিক ওদিক উড়তে থাকে। নন্তু সরে আসার সাথেই আবার মাছিগুলি বিপুল বিক্রমে রবির মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এ-দৃশ্য তাকিয়ে দেখা অসহ্য। মিনু স্বামীর পাশে বসে হাতপাখা নিয়ে তাড়া দেয় মাছিগুলিকে।

রবির ঝিমিয়ে পড়া চৈতন্য মানুষের আভাষ পেয়ে জেগে যায়। চোখ মেলে সে তাকায় মিনুর দিকে।

স্বামীর ঘোলাটে দৃষ্টির পানে চেয়ে মিনু ভয়ে কেঁদে ফেলে।

—কি করে এমন হোল তোমার ?

রবির শীর্ণহাত থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে উপরে উঠে অবলম্বন না পেয়ে এদিক ওদিক দুলতে থাকে।

মিনু পাখা রেখে স্বামীর দুর্ব্বল কম্পমান হাতটি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। কি ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে হাত। ঠিক যেন বরফ চাপা মাছের গায়ের মত।

—ডাক্তার ডেকে আনব মা ? নন্তু শুধোয় মিনুকে।

—কাকে ডেকে আনবি ? পাড়ার ঐ নতুন ডাক্তার কি বিনি পয়সায় আসবেন আমাদের এখানে ? তুই এক কাজ কর—আশু-ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়।

—সেই কারখানার ডাক্তারবাবু মা ? বড় রাস্তা পেরিয়ে বাজারের পাশে দিয়ে শিবঠাকুরের বাড়ীর ধারে যার দোকান। তার কথা বলছ মা...

—হ্যাঁঃ ; সেই ডাক্তারবাবুকে গিয়ে বলবি তোর বাবার কথা।

রুগী থাকলে বসে থাকবি। চলে আসিস্‌নে, যতক্ষণ হয় বসে সাথে করে নিয়ে আসা চাই…

—তিনি ঠিক আসবেন মা, সেদিন আমাকে ডেকে তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

রবির ঠোঁট দুটি কাঁপে। মিনুর দিকে চেয়ে কি যেন বলতে চায়। দৈহিক দুর্ব্বলতা জিবকে ভাষা জোগাতে পারেনা।

এ ধাক্কায় রবির ক্ষীণ জীবনী শক্তিটুকু নিঃশেষে নিংড়ে বের হয়ে যেতে চেয়েছিল। ডাক্তারের আপ্রাণ চেষ্টায় আটকে আছে কোন-রূপে। ডাক্তারবাবু বার বার বলে গিয়েছেন কয়েকটি মূল্যবান ওষুধ ও পথ্যের জন্য। ওসব না হলে রবির ভাল হয়ে ওঠার পক্ষে রয়েছে সন্দেহ।

কোথায় পাওয়া যাবে টাকা? হাতে নেই একটি পয়সা। আত্মীয়-স্বজনের দিকও ফাঁকা। যোগেশদা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

বউরাণীর কাছে গিয়েই কয়েকটি টাকা চেয়ে দেখতে হবে। যদি পাওয়া যায় ত ওখানেই পাওয়া যাবে। তাছাড়া সেই যে বড়বাড়ী থেকে বের হয়ে স্বামীর পাশে এসে বসেছে, একদিনের তরেও ফিরে যায়নি সেখানে। ওখানে একবার যাওয়া দরকার।

ওষুধের ক্রিয়ায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে রবি।

বিছানার উপর মিশে থাকা স্বামীর দেহের দিকে তাকিয়ে মিনুর দু'চোখ জলে ভরে যায়। অস্বীকার সে করতে চায়না। এ অশক্ত দেহের সান্নিধ্যে তার মন বিষিয়ে উঠেছিল। সেজন্য শাস্তি তার কম হয়নি। এখন সে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুক।

নন্তুকে রোগশয্যা পাশে বসিয়ে রেখে মিনু বড় বাড়ীমুখো রওনা দেয়।

শর্ব্বরী ছিলনা বাড়ী, বহুক্ষণ বসে থেকে মিনু বাড়ীর দিকে ফিরে

নিরাশায় ভারাক্রান্ত, রোদে তপ্ত, পথের পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত ক্লান্ত শরীর নিয়ে মিনু বাড়ীতে ফিরে দেখে, আশুডাক্তার এসে বসে আছে। তীব্র ওষুধের গন্ধে ভরে আছে চারপাশের বাতাস।

বিছানার উপর টান টান হয়ে পড়ে আছে রবি।

—কি হয়েছে ডাক্তারবাবু? স্বামীর শয্যাপাশে বসে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে মিনু।

গম্ভীর মুখে আশুডাক্তার বলে, অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ফের। এমন-ভাবে চল্লে সেরে ওঠা মুস্কিল হবে তোমার স্বামীর। যেমন করেই হোক, টাকা যোগাড় করে ওষুধ-পথ্য নিয়ে এসো; নয়ত ওকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দাও। এভাবে চিকিৎসা চলেনা।

ব্যাগ গুছিয়ে আশুডাক্তার চলে যায়।

নীচের ঠোঁটটুটি দাঁত দিয়ে চেপে মিনু বসে থাকে। স্বামীকে বাঁচাতে হলে টাকার প্রয়োজন। যে কোনভাবে সে টাকার যোগাড় করতে হবে, নতুবা মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে হবে।

হাসপাতালের কথা চিন্তা করতে সে পারেনা। দুশ্চিন্তায় ওর মুখ কালো হয়ে যায়!

মাথা নীচু করে রাস্তা দিয়ে নন্তু চলেছে দ্রুত।

বাপের ব্যায়রাম, মায়ের শুষ্কমুখ দেখতে ভাল লাগেনা। সে যদি

টাকা রোজগার করতে পারত, তা'হলে এতো দুঃখ থাকতো না নিশ্চয়।

মাণিকতলার ওদিকে একটা রেষ্টুরেণ্টে কাজ করে বন্ধু গোপাল। কাজ নেবার আগে পর্য্যন্ত ওর সাথে খুব খাতির ছিল নন্তুর। মার্ব্বেলের জুয়া খেলায় সে সব সময় নন্তুকে দলে নিত। ওর কাছে গিয়ে একটা চাকুরী চেয়ে দেখতে হবে।

নন্তু যখন গোপালের রেষ্টুরেণ্টে এসে পৌঁছায়, তখন সে কতকগুলি উচ্ছিষ্ট ডিস্ ধুয়ে রাখছিল সাজিয়ে। নন্তুকে দেখে জিজ্ঞেস করে, কি রে কি খবর?

—বাবা বোধহয় বাঁচবেনারে বাদল। পয়সা নেই যে ভাল ওষুধ এনে খাবে। মাও কেমনধারা হয়ে গিয়েছে, কোন কিছুতেই খেয়াল নেই।

নন্তুর দু'চোখের কোনে জলবিন্দু চিক্ চিক্ করে।

—কাঁদিসনে নন্তু! দেখিস্—তোর বাবা ঠিক ভাল হয়ে যাবে।

চোখের জল ছেঁড়া জামার কোনে মুছে নন্তু বলে, একটা চাকুরী দিতে পারিস্?

—চাকুরী!—চাকুরী করবি তুই? তুই যে আমার চেয়ে অনেক ছোট।

—ছোট হলেও দেখিস্—ঠিক কাজ করতে পারব।

গোপাল নন্তুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে বলে, আচ্ছা, আমি চেষ্টা দেখব। আসিস্ কয়েকদিন বাদে।

মাণিকতলা ছেড়ে নন্তু শেয়ালদার দিকে এগিয়ে চলে। আজকের ভেতর যেভাবেই হোক টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করতেই হবে।

বউবাজার পেরিয়ে এসে নন্তু থম্‌কে দাঁড়ায়। প্রকাণ্ড এক সিনেমা

হল উঠছে রাস্তার গা ঘেঁসে। একজন সর্দ্দার মিস্ত্রী বসে আছে। কুলিমজুররা কাজ করছে।

নন্তু মিস্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

—কি চাই খোকা? প্রশ্ন করে সর্দ্দার।

—আমাকে একটা কাজ দাও সর্দ্দার। আমি কাজ করব।

—তুম্‌হি কাজ করবে—তুম্‌হি?—এ্যাঃ! বাড়ী থেকে গোঁসা করে এসেছ, কোথা বাড়ী আছে তোমার?

নন্তু যতই বোঝাবার চেষ্টা করে, মিস্ত্রি ততই উল্টো করে ধরে করে ঠাট্টা, সাঙ্গোপাঙ্গোরাও সর্দ্দারের সাথে যোগ দেয়।

ক্ষোভে, দুঃখে নন্তুর কান্না পায়। ফের সে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে যায়, ক্ষিধেতে পেটের নাড়িভুঁড়ি পাক খায়। রাস্তার পাশে বন্ধ একটা দোকানের সিঁড়ির উপর বসে পড়ে।

ছোট বলে কেউ দিতে চায়না আমল। ওর রাগ হয় বয়সটার উপর। বয়স যদি রবারের মত টেনে লম্বা করা যেত, তা'হলে সে এই মুহূর্ত্তে ওটাকে টেনে টেনে সুমুখের ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটার মত লম্বা করে ছাড়তো!

অভিমানে নন্তু চোখ ঢাকে।

কতক্ষণ কেটে গিয়েছে খেয়াল নেই। মাথার উপর হাতের ছোঁয়াচ পেতেই সে চম্‌কে যায়। মাথা তুলে দেখে,—একজন আধ-বয়সী ভদ্রলোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে তাকে।

ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় নন্তু।

ভদ্রলোক নন্তুর কাঁধে হাত রেখে বলে, কাঁদছ কেন খোকা! ক্ষিধে পেয়েছে?

নন্তুর মনের ভাব যেন বুঝতে পেরেছে সে। বলে,—ভয় করোনা, কি হয়েছে আমাকে বল...

লোকটির দরদ-মাখানো কথা অপরিচয়ের গণ্ডী ভেঙে দেয়। ছল্-ছলিয়ে ওঠে নন্তুর দু'চোখ। ঢোক গিলে বলে, বাবার বড্ড অসুখ বাবু! তাকে বাঁচাতে হলে দামী ওষুধ খাওয়াতে বলেছেন ডাক্তার বাবু। আমি রোজগার করে বাবার ওষুধ কিনে দোব।

—রোজগার করতে চাও—এই কথা, লোকটির চোখ নেচে ওঠে।

—যাবে আমার সাথে, কাজ দোব।

—কতদূর যেতে হবে বাবু?

—এই কাছেই···

—আমি যে ছোট; আমাকে দিয়ে কি কাজ হবে?

—হবে বই কি; নিশ্চয় হবে, চলো আমার সাথে।

নন্তুকে নিয়ে বাবু একটি বস্তির ভেতর ঢোকে। দরজার তালা খুলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দু'জন।

—তুই বোস্—আমি আসছি এখনই—

বসে বসে নন্তু দেখে ঘরের একদিকে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা ষ্টীলের ট্রাংক্। অন্যদিকে একটা তক্তপোষ পাতা। দেয়ালের গায়ে টাঙানো দড়িতে নানা মাপের কয়েকটি ব্যবহৃত জামা, প্যাণ্ট ও কাপড়।

হাতে একটা শালপাতার ঠোঙা এবং প্রায় নন্তুর সমবয়সী একটি ছেলেকে নিয়ে লোকটি ফিরে আসে ঘরে। ঠোঙাটা নন্তুর হাতে দিয়ে বলে, খেয়ে নে চট্ করে।

ছেলেটিকে নিয়ে এককোণে গিয়ে বসে সে।

ঠোঙার ঢাকনি তুলে ভেতরের দিকে তাকিয়ে নন্তু বলে, সবগুলিই কি আমি খাব বাবু?

—হ্যাঃ...হ্যাঃ ··যা পারিস্ খেয়ে নে—

চারটি কচুরী ও তরকারী, দুটো সিঙাড়া, দুটো রসগোল্লা ও একটি সন্দেশ। এর মধ্যে কোনটিই আস্ত খেয়ে দেখার সৌভাগ্য ওর হয়নি। গো-গ্রাসে সে খেতে থাকে।

ওদিকে লোকটি তখন ছেলেটিকে বলছে, ওরা সব কোথায়? তুই একা এলি কি করে? তোর চালই বা করলি কি?

—বড্ড পুলিশের কড়াকড়ি ছিল আজ ট্রেনে বাবু। কি আদালত যেন?—ওরা অনেক লোক ধরেছে আজকে। কানাইদার সাথে কাঁকুড়গাছির ওখানে শেকল টেনে নেমে গিয়েছে সব। আমাকে একটা পুলিশ তাড়া করেছিল, পালিয়ে এসেছি। চালের ব্যাগ নিয়ে আসতে পারেনি—

—কেউ ধরা পড়েছে?

—ওরা সব আমার আগেই সরে পড়েছিল। এ—বাবু! দশ সেরের বেশী বোঝা আমি নিতে পারবনে—

—সে হবে'ক্ষণ; তুই এখন বাড়ী যা, রাত্তিরে মানুকে যাবে তোর বাড়ীতে।

ছেলেটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

কিছুটা ক্ষিধের নিবৃত্তি হতেই ছোট বোনটির কথা মনে হয় নন্তুর। ভেসে ওঠে ওর কাঁদামাখা শুষ্ক মুখখানি। একখানা সন্দেশ ও দু'খানা কচুরী রেখে সে ঠোঙাটি ভাঁজ করে নেয়।

—খাওয়া হোল তোর?

—আজ্ঞে বাবু, পরে খাবার জন্য দুটো রেখে দিলাম।

—আচ্ছা ঐ কোনে রেখে দিয়ে এগিয়ে আয়।

লোকটি নন্তুর প্যাণ্ট ও সার্ট খুখে ট্রাঙ্ক থেকে এক টুকরো সাদা নতুন থান পরিয়ে দেয় ওকে। চুলগুলিতে খড়িমাটি ঘসে ও তা ঝেড়ে নিয়ে তৈরী করে চুলের অপূর্ব্ব রুক্ষতা। একটা চাবি দড়ি দিয়ে নন্তুর গলায় মালার মত ঝুলিয়ে দেয়। তারপর কুশাসন হাতে দিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায় নন্তুর দিকে।

—খাসা মানিয়েছে তোকে। শোন্—শেয়ালদা ষ্টেশনে তোকে রেখে আসব। মেয়েছেলে এবং গেঁয়ো লোক দেখে তাদের কাছে গিয়ে বলবি, বাপ মারা গিয়েছে। দয়া করে কিছু সাহায্য করুন। বাপের নাম জিজ্ঞেস করলে তোর বাপের নামই বলে দিস। ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে বলবি, ১১নং রামতনু লেন্।

জীবন্ত বাপকে বলতে হবে মরে গিয়েছে। ভয়ে ছ্যাৎ করে ওঠে নন্তুর বুকের ভেতরটা।

—ও কাজ আমি পারবনা বাবু। নন্তু সাফ জবাব দেয়।

লোকটা পকেট থেকে ঝক্‌ঝকে দুটি কাঁচা টাকা বের করে নন্তুর চোখের সুমুখে নাচিয়ে বলে, এই দেখ! এটুকু মিথ্যে বল্লে রোজ দুটি করে টাকা মিলবে। সে টাকা দিয়ে তুই তোর বাপকে ভাল করে তুলতে পারবি।

টাকা দুটির দিকে চেয়ে নন্তুর মাথার ভেতরটা পাক খেয়ে ওঠে। লোকটার কথামত কাজ করলে এ দুটো টাকার অধিকারী হবে সে? ওর কচিমন হয় লোভে আতুর। কিন্তু বাবা মরে গিয়েছে একথা বলা যে অসম্ভব।

—শোন ছোকরা! আচ্ছা না বল্লি তোর বাপের নাম। বলিস্—মধু দত্ত মরে গিয়েছে এবং তুই সাজবি তার ছেলে। এটা পারবি ত?

—আজকে ছেড়ে দিন বাবু। মাকে জিজ্ঞেস করে কাল এসে বলব। নন্তু অনুনয় করে।

—যদি তুই আমার কথামত কাজ করিস, তা'হলে এই তিনটে টাকাই তোর হবে। পকেট থেকে আরেকটি টাকা সে বের করে মেলে ধরে নন্তুর চোখের সুমুখে।

নন্তুর অপরিপক্ক মস্তিষ্ক টাকার চেয়ে বাপকে বড় করে নেয়। —ও ··আমি কিছুতেই পারবনা বাবু।

—তা'হলে শালা এতক্ষণ চুপ করে ছিলি কেন? শুয়ার কোথাকার! গালি আরম্ভ করে লোকটি যেন ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। নন্তুর পিঠের উপর চড়-চাপড়ের বর্ষণ আরম্ভ হয়।

অসহনীয় হয়ে উঠতেই নন্তু ছিটকে ছুটে পালায়।

রাস্তার দিকে চেয়ে মিনু ভাবছিল ছেলের কথা। সেই সকালে কোথায় বেরিয়েছে, সন্ধ্যে হয়ে এল ফেরার নাম নেই। অতটুকুন ছেলে কোন সর্ব্বনাশ হয়েছে কে জানে।

রবির অবস্থা আজ ভাল নয়। গত রাত থেকে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে তার সমস্ত দেহ। জ্বরের ধমকে সংজ্ঞাহীনের মত পড়ে আছে রবি। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে মিনু। পিনাকী রায়ের কথা কেন

জানি হঠাৎ করে মনে পড়ে। মনে পড়ে দাদাবাবুর সেদিনের সে কথাগুলি।

নিজের সুন্দর দেহের দিকে চেয়ে আজ গর্ব্বে ওর মনের ভেতর ভরে ওঠে না। অর্দ্ধাহার ও অনশনে, দুঃখ ও কষ্টে এ সৌন্দর্য্য কেন ওর নষ্ট হয়ে গেলনা। অন্য দশজনের মত কেন সে কুড়িতে বুরিয়ে গেলনা। এ সৌন্দর্য্য না থাকলে ত পুরুষগুলি অমন করে উন্মাদ হয়ে উঠত না। রোজগার করার পথেও থাকতনা কোন বাধা।

সুমুখ পানে নজর পড়তেই আঁৎকে ওঠে মিনু। থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে সে। একি সাজে সেজে নন্তু এসে দাঁড়িয়েছে। আতঙ্কে গলা চিরে একটা চিৎকার বেরোতে চায়। কিন্তু রবি ত বেঁচে আছে।

নন্তুকে বুকে জড়িয়ে ধরে মিনু।

নন্তু কেঁদে জানায় সমস্ত ঘটনা।

সহ্য করতে পারেনা মিনু ছেলের এ দুঃসহ পোষাক। ছাড়িয়ে একটা ছেঁড়া মলিন ইজের পরিয়ে দেয়।

ঘরের মাঝে রবির দেহ বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে। আতঙ্কে মিনু শিউরে ওঠে। দু'চোখ বিস্ফারিত করে নন্তু দেখছিল বাপের দেহ।

ডুকরে কেঁদে সে বলে, আজকে বাবা আর বাঁচবেনা না।

কথাটা মিনুর পিঠের উপর চাবুকের ঘা দেয়। তার চোখে জাগে নন্তুর সে মর্ম্মান্তিক বেশ।··

কেমন জানি টেনে টেনে হেসে মিনু বলে, টাকা চাই,—না রে নন্তু? টাকা নইলে তোর বাবা বাঁচবেনা—না? একটু বোস্ দেখিস্—কত টাকা নিয়ে আসছি। বলেই উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপে ঝটিকার মত সে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

পথের মাঝে কাল বৈশাখীর পাগ্‌লা হাওয়ার ঝাপ্‌টা মিনুর মুখে চোখে আঘাত করে। ঈশানের কালোমেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। পথঘাট ভরে আছে ধূসর পাংশুল ধূলিতে। বিদ্যুৎ বিদীর্ণ শুন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল উড়ে চলেছে গৃহের দিকে।

মিনুর দুইচোখের দৃষ্টিকে বুজিয়ে দিয়ে একটা বিদ্যুতের শিখা মিলিয়ে যায় ধরিত্রীর বুকে। একটু দূরে বিশ্রী শব্দ করে একটা বাজ ফাটে। ছুরির ফলার মত ধারালো বৃষ্টির ছাঁট চোখে মুখে এসে বিঁধতে থাকে।

ঘরের মাঝে নিরিবিলি জানালার কোনটিতে বসে পিনাকী দেখছিল তাণ্ডব। পেছনে শব্দ পেয়ে ফিরে তাকায়। চম্‌কে যায় সে মিনুকে দেখে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে।

উত্তেজনায় মিনুর ফর্সা মুখ যেন আগুনে তাঁতানো। শান্ত চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, নাসা বিস্ফারিত। সমস্ত শরীর কাঁপছে থর থর করে। সিক্ত চুলের জল টপ্‌ টপ্‌ করে পড়ছে চিবুক বেয়ে। যেখানে সে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে একটা জলের ধারার সৃষ্টি হয়েছে। ভেজা শাড়ী লেপ্‌টে আছে দেহের সাথে। মাংসপেশীর রেখা স্পষ্ট।

মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পিনাকী।

বাইরে হাল্কা মেঘের ছোটাছুটি…জলের ফোঁটার ঝম্‌ঝমানি… হাওয়ার লুটিপুটি। ঘরের মাঝে নিরব—নিথর।

—কয়েকটা টাকার জন্য এসেছি বাবু।

কোন অতলতল থেকে যেন শব্দ বেরোয়। মিনুর কথাটা যেন কান্নায় ভিজে ভারী অব্যক্ত ব্যথায় অস্ফুট।

—টাকা ?—পিনাকীর চোখ উজ্জ্বল্ হয়ে ওঠে। এগিয়ে গিয়ে সে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

বাইরে থেকে এক ঝলক্ পাগ্‌লা হাওয়া ছুটে এসে ঘরের মাঝে লুটিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

হাতের মুঠিতে কয়েকটা নোট চেপে বাইরে এসে দাঁড়ায় মিনু। কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে থাকে। মাথার ভেতরটা যেন উল্টে পাল্টে গিয়েছে।

কেন সে এখানে এল ? একি হয়ে গেল ? এমন যে সে চায়নি। বিক্ষুব্ধ মনকে কি দিয়ে সে বোঝাবে ?

দেহের জ্বালা দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। স্বামীর কথা মনে হয়। কান্না পায় মিনুর। তবু সে এগিয়ে চলে।

কখন যে সে পা-পথে নেমে এসেছে এবং পা-পথ ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে এবং সে রাস্তা যে বাড়ীর রাস্তা নয় খেয়াল নেই। মটোরের জোর ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ শব্দে ক্ষণিকের জন্য তার সম্বিত ফিরে আসে। কিন্তু সময় পাওয়া যায়না। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা ওকে রাস্তার উপর শুইয়ে দেয়।

দুঃসহ যন্ত্রণায় জ্ঞান হারায় মিনু।

১৩

জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে যোগেশ। বাড়ীতে পা দিয়ে সে চম্‌কে ওঠে। কত রোগা হয়ে গিয়েছে লক্ষ্মী। চোখের কোনে ওর কালী পড়ছে পুরু হয়ে। পড়নের কাপড়খানায় বেশ বড় কয়েকটা তালি। মাথার চুলগুলিতে যে কতদিন তেল পড়েনি ঠিক নেই।

মাথা নীচু করে একাগ্রমনে ঠোঙ্গা তৈরী করছিল লক্ষ্মী। মেঝেতে কাগজ, আটা ও তৈরী ঠোঙ্গায় ছড়াছড়ি। স্বামীকে দেখে তার মুখে হাসি খেলে যায়। কাগজপত্রগুলি একপাশে ঠেলে রেখে সে উঠে দাঁড়ায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নেয় যোগেশ।

—কোন কষ্ট দেয়নি ত এবার? স্বামীর পাশে বসে সস্নেহে তার একটা হাত নিজের দু'হাতের মাঝে নিয়ে প্রশ্ন করে লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীর মত চট করে কথা বলতে পারেনা যোগেশ। একরাশ জিজ্ঞাসার চাহিদায় ওর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

প্রশ্ন আর করেনা লক্ষ্মী। স্বামীর পাশে চুপ করে বসে থাকতেই যেন ভাল লাগে।

সময় এগিয়ে চলে।

বগলে এক বাণ্ডিল কাগজ নিয়ে কোত্থেকে লাফাতে লাফাতে রদ্দুরে লাল হয়ে বাদল এসে হাজির। বাপকে দেখে ও থম্‌কে দাঁড়ায়।

যোগেশ তাকিয়ে দেখে, হাতে পায়ে বেশ বড় হয়ে উঠেছে ছেলে।

—ওকি !...দূরে দাঁড়িয়ে রইলি যে। কাছে আয়। যোগেশ ছেলেকে আদর করে কাছে টেনে নেয়।

সুবোধ বালকের মত বাদল বাপের পাশটিতে বসে পড়ে।

—রদ্দুরে বুঝি আজকাল খুব ঘোরা হচ্ছে? ছেলেকে প্রশ্ন করে যোগেশ।

মা ও ছেলের চোখাচখীর মাঝ দিয়ে কি যেন ইঙ্গিতের বিনিময় হয়ে যায়। বাদল মাথা নীচু করে চুপ করে থাকে।

লক্ষ্মী তাড়া দেয়, নাও হাত-মুখ ধুয়ে এস।

—আরেকটুকু বসো লক্ষ্মী। যোগেশ স্ত্রী ও পুত্রের হাত চেপে ধরে থাকে।

যোগেশের মুক্তি সংবাদ পেয়ে পুরোনো সহকর্ম্মীদের মাঝে দু'একজন এসে দেখা করল। রাজনীতি ওরা ছেড়ে দিয়েছে। যোগেশ নতুন করে কাজ আরম্ভ করতে চায়। ওরা উৎসাহ দেয় না মোটেই. একটা কারখানায় এখন দশটা দল। কারুর সাথে কারুর মিল নেই। সুযোগ পেয়ে মালিক বে-পরোয়া। যা খুশী তাই করছে। কে প্রতিবাদ করবে? এ ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকাই ভাল, আর তৃতিয় যুদ্ধ না লাগা পর্য্যন্তই ত জীবনের মেয়াদ। যুদ্ধ যখন যে কোন সময় লেগে যেতে পারে, তখন ওসব ঝক্কির মাঝে না গিয়ে এ ক'টা দিন হেসে খেলে কাটিয়ে দাও যোগেশদা। ওরা যোগেশকে উপদেশ দিয়ে চলে যায়।

যোগেশের মনটা দমে যায়। এসব সহকর্ম্মী একদিন বুলেটের মুখে দাঁড়াতেও ভয় পায়নি. আজ কতনা পরিবর্ত্তন।

অজয়বাবুর সাথে দেখা করে যোগেশ। ভদ্রলোক একটা মাসিক

পত্রিকার সম্পাদক হয়ে বসেছেন। যোগেশকে উপদেশ দেন কাজ আরম্ভ করবার জন্য।

আশা ও আনন্দে যোগেশের মুখ ঝলমলিয়ে ওঠে। বলে, সে জন্যই ত আপনাকে নিতে এলাম অজয়বাবু।

অকারণেই চশমার কাঁচ রুমাল দিয়ে বার বার ঘসতে থাকেন অজয়বাবু।

—আমি ত তোমার সাথে রয়েছিই হে! তবে এদিকের এতবড় একটা দায়িত্ব, বুঝতেই ত পার। তা ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমার চেয়েও মজবুত একটি ছেলেকে দোব এবার।

অজয়বাবুর কথা কয়টি যেন যোগেশের মুখের রক্ত শুষে নেয়। ওর শান্ত চোখে একটা জ্বালা ফুটে ওঠে। উঠে দাঁড়ায় সে, মনের ক্ষোভটা কিছুতেই দমন করতে পারেনা। বলে, কাউকে আর পাঠিয়ে কি লাভ অজয়বাবু? সে যে আপনার মতই আবার আরেকজনকে পাঠাবে। আমাদের মত মুর্খ ও দরিদ্রের মাঝে কি আর আপনাদের মত ভদ্রলোকদের মন বসে?

চোখের জলটা লুকোতে গিয়ে যোগেশ হঠাৎ করেই বেরিয়ে আসে রাস্তায়।

সমস্ত পথ ওর মাথাটা যেন জ্বলতে থাকে দপ্‌ দপ্‌ করে। কতনা আশা...কতনা ভালবাসত সে অজয়বাবুকে। অজয়বাবু যেদিন প্রথম ইউনিয়ন গড়ার জন্য গিয়েছিলেন কারখানায়, সে আজ বহুদিন আগেকার কথা। তবু মনে হয় যেন সেদিন।

অজয়বাবুর চারপাশে গোল হয়ে বসত ওরা। কত নতুন কথা শোনাতেন তিনি। কতনা বোঝাতেন, কতনা শেখাতেন। সে সব

কথাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখত যোগেশ। ফলে কারখানার কাজে আর উন্নতি হয়নি যোগেশের, সেজন্য কোনদিন ক্ষোভও আসেনি মনে। ইউনিয়নের কাজে…সহকর্মীদের সুখে-দুঃখে নিজকে বিলিয়ে দিয়ে পরম একটা তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিল সে।

অজয়বাবুর কাছ থেকে যে কখন এ ধরণের কথা শুনতে হবে কল্পনাও করতে পারেনি সে। যে আশা নিয়ে সে আজ এসেছিল অজয়-বাবুর সাথে দেখা করতে, সে আশাটা যে ভেঙ্গে চুর চুর হয়ে গেছে। রক্ত দিয়ে গড়া ইউনিয়নের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল তার ঐ কাগজ? ওকাজ কি অন্য কাউকে দিয়ে হোতনা? পাখার হাওয়া খেয়ে চেয়ারে বসে দু'কলম লেখার মত লোকের অভাব ত নেই পার্টিতে। অজয়বাবুই যদি বিশ্রাম খোঁজে, তা'হলে তার নিজের বিশ্রামের যে আরও প্রয়োজন। সংসারের দিকে তাকান তার দরকার। লক্ষ্মীকে একটু সুখ, একটু বিশ্রাম দেওয়াও কর্ত্তব্য। বাদলকে মানুষ করার পরিপূর্ণ দায়িত্বও যে তার। আর তিনটে বছর পরই যে সে ম্যাট্রিক দেবে। না…না…আর সে সময় নষ্ট করবেনা। ওদের ভবিষ্যৎ ভাসিয়ে দেবার অধিকার তার নেই। দক্ষ কারিগর সে, কাজের অভাব তার হবেনা। সব ছেড়ে দিয়ে কাজ করতে চাইলে পুরোনো মালিকই যে নিয়ে নেবে। আর কি দরকারই বা ওসব ঝামেলায় গিয়ে। গভর্মেণ্ট ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেই শ্রমিকদের উন্নতির জন্য। ভাল ঘর, জীবন বীমা, বেতন বৃদ্ধির জন্য যে আইন প্রণয়ন করা সরু করেছে।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখে শেষরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় যোগেশের। পাশে নেই লক্ষ্মী, উঠে বসে যোগেশ। বাদলের বিছানাও খালি। মৃদু

আলোর রেখা দেখা যায় রান্নাঘরে। কৌতুহলে পা টিপে টিপে যোগেশ নিশ্চল হয়ে যায়।

লম্ফো জ্বেলে মেঝের উপর উঁবু হয়ে বসে মা-ছেলে নিবিষ্ট মনে কি যেন করছে? তাদের বিরাট ছায়া বেড়ার গায়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। গল গল করে কেরাসিন পোড়া কালি বেরোচ্ছে লম্ফোর মুখ দিয়ে।

যোগেশ আরো একটু এগিয়ে গিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে চমকে যায়।

মেঝের উপর কাগজ বিছিয়ে লাল কালিতে আঙুল ডুবিয়ে বাদল লিখে যাচ্ছে প্রাচীরপত্র। ছোট্ট একটা চিরকুট দেখে লক্ষ্মী বলছে তাকে অনুচ্চ কণ্ঠে।

যোগেশের চেতনা প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে কেঁপে ওঠে।

লক্ষ্মী বলছে ছেলেকে, ওরা তোমাকে যা দিচ্ছে তাতে খুশী হয়ে ওদের বাঁচার সুযোগ দিওনা। ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভাগ্য ওদের হাতে ছেড়ে দিওনা। শোষক ও শোষিতের বিভেদ মুছে ফেলার জন্য যারা রক্ত দিয়ে গেল, তাদের বিশ্বাসকে নষ্ট করোনা।...

আকাশের শুকতারা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। তারাগুলি যাচ্ছে কোন অতলতলে হারিয়ে। রাতের আঁধার ফিঁকে, বাদুরের ঝাক ফিরছে ঘরে। কাকের ঘরে কলরব। প্রভাতের আর দেরী নেই। বাদলের লাল আঙুল কাগজের উপর রক্তিম অক্ষর গেঁথে চলেছে দ্রুত। আলো ফুটবার আগেই যে এগুলি দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দিয়ে আসতে হবে।

টলতে টলতে যোগেশ ফিরে যায় ঘরে। দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে চোখের কোন বেয়ে। আত্মধিক্কারে...না আনন্দে? সেই জানে।

১৪

কয়েকদিন যাবৎ কারখানায় রবি আসেনা, প্রথম প্রথম রবির অনুপস্থিতিতে মায়া যেন হাঁফ ছাড়ার প্রয়াস খোঁজে। কিন্তু যতই দিন যায় মায়ার মনে একটা উৎকণ্ঠা এসে বাসা বাঁধতে থাকে।

রুগ্ন মানুষটার কোথায় কি হয়ে গেল কে জানে...হোদকা মালিকটা কি রবিকে জবাব দিয়েছে,—না, ব্যায়রামেই পড়ে আছে!—না, অন্য কোথাও কাজ নিয়েছে!

গত রাত্রিরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যায় মায়ার। সেই থেকে উৎকণ্ঠার সাথে একটা ভীতি ওকে ভাবিয়ে তোলে।

স্থির থাকতে পারেনা সে। ভোরবেলায় ভীড় কমতেই চায়ের দোকানের ছোঁড়াটাকে ডেকে একটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে মায়া জিজ্ঞেস করে।—হ্যারে মাণিক; ও কারখানার নতুন মিস্ত্রীকে দেখছি না কেন?

মাণিক টাকাটা নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে বলে,—কার কথা বলছ মাসি; ঐ—সেই রোগা মিস্ত্রীর কথা কি?

—হ্যাঃ—সেই যে ঐ দরজার কাছের যন্ত্রটায় কাজ করত।

—সে ব্যায়রামে পড়ে আছে। চেন নাকি তাকে?

—হুঁ! আমাদের গাঁয়ের লোক। অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয় মায়া।

—তোমার কি কেউ হয়? মায়ার শুষ্ক মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে মাণিক।

কোন উত্তর দেয়না মায়া। কি যেন চিন্তার মাঝে ডুবে যায় সে।

মাণিক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। কিন্তু মায়ার দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়না।

টাকাটা এহাত ওহাতে নাড়াচাড়া করে মাণিক বলে,—টাকা দিয়ে কি এনে দোব মাসি?

—এ্যাঃ!···টাকা;—টাকা তুই নিয়ে যা।

দু'এক আনা বক্‌শিস্ মাসির কাছ থেকে মাঝে সাঝে মাণিক পেয়ে থাকে। গোটা টাকা কখন ভাবতে পারেনি। আনন্দে আপ্লুত হয়ে সে জিজ্ঞেস করে,—কি করব মাসি?

মায়া মাণিকের দিকে অবোধ্য এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে,—না; তোর কিছু করতে হবেনা, তুই যা এখন—

মাণিক চলে যায়; কিন্তু সেখানে মায়া দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

রবির খোঁজ নেবার ইচ্ছা বহুকষ্টে দমন করে সে। মনের মাঝে একটা কাঁকুতি, একটা শঙ্কা, থেকে থেকে শুঁশুকের মত ঘাঁই দিয়ে ওকে ভাবিয়ে তোলে।...

এরপর দু'দিনও পার হয়নি, মাণিক একটা ছেলেকে নিয়ে মায়ার দোতলায় উঠে আসে। ওর কলকণ্ঠের আহ্বানে মায়া ঘর থেকে বেরিয়ে মাণিকের পাশের ছেলেটিকে দেখে চম্‌কে যায়।

—সেই যে মিস্ত্রীর কথা বলেছিলেনা মাসি? সেই মিস্ত্রীর ছেলে গো! বাপের বেতন নিতে এসেছিল, ধরে নিয়ে এলুম।

মায়া একটা ধাক্কা খেয়ে থম্‌কে যায়। রবির ছেলে ?—মায়ার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে।

ছেলেটা মুখের আদল পেয়েছে রবির ; গায়ের রং কিন্তু বেশ ফসা। ওর স্বচ্ছ কালো চোখদুটি নিষ্প্রভ ; মুখের মাঝে একটা করুন অভিব্যক্তি।

নন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে ঈর্ষা ও স্নেহের একটা বিচ্ছুরণ বয়ে যায় মায়ার মনের মাঝে।

অবাক-বিস্ময়ে নন্তু দেখছিল মায়াকে। কিছুতেই সে বুঝে উঠতে পারছিলনা—কেন যে চায়ের দোকানের ছোঁড়াটা এখানে নিয়ে এল ওকে! সৌখীন শাড়ীপড়া গয়নায় ঢাকা মহিলাটির দিকে চেয়ে নন্তুর দু'চোখ ছল্‌ছলিয়ে ওঠে। দুঃখিনী মায়ের মলিন মূর্ত্তিটি বড় স্পষ্ট হয়ে ভাসে। তার ছেঁড়া শাড়ীটা ঘরের মাঝে দড়িতে যে এখনও ঝুল্‌ছে।

এগিয়ে এসে মায়া নন্তুর চিবুক স্পর্শ করে। নন্তু মাথা নীচু করতেই দু'ফোঁটা উষ্ণজল ওর হাতের উপর পড়ে ছড়িয়ে যায়।

—কাঁদছ কেন? মায়া নন্তুকে প্রশ্ন করে।

নন্তু নড়েনা ; উত্তর দেয়না ; মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

নন্তুর সাথে ঘনিষ্ঠতা করতে মায়ার বেশী সময় লাগেনা। খুঁটে খুঁটে মায়া সব জেনে নেয় নন্তুর কাছ থেকে।

মরণাপন্ন রবি, গৃহ থেকে পলাতকা মিনু, মাছাড়া ছেলেমেয়ে দুটি। মায়া একটা দ্বন্দ্ব অনুভব করে নিজের মাঝে।

একটু চিন্তা করে মায়া নন্তুর হাতে দশটি টাকা দিয়ে বলে,—এ টাকাটা নিয়ে যাও, খারাপ কিছু হলে আমাকে এসে খবর দেবে. বুঝলে—

—আচ্ছা! নন্তু টাকাগুলি প্যাণ্টের সেলাই করা ভাঁজে গুঁজে নেয়।

—আর শোন!—তোমার বাবা যদি কিছু জিজ্ঞেস করে;—কি বলবে—

—বাবা কোন কথাই বলেনা আজকাল। নিরাশকণ্ঠে উত্তর দেয় নন্তু।

—ওঃ! মায়া থেমে যায়।

সেদিন সারারাত জেগে সকালে মায়া একটু ঘুম দেবার ব্যবস্থা করছিল। নন্তু দৌড়ে এসে ঘরের মাঝে বসে পড়ে।

কাল রাত থেকে রবি যেন কেমন কচ্ছে। একাকী ঘরে নন্তু সাহস পায়নি, তাই ছুটে এসেছে।

মায়ার ঘুমান হয়না, বিছানার উপর বসে সে চিন্তা করে। কয়েকটা টাকা দিয়ে নন্তুকে বিদেয় করার কথা সে প্রথম ভাবে। কিন্তু নন্তুর করুন-কচি মুখের দিকে চেয়ে সে ইচ্ছা তার বেশীক্ষণ থাকেনা। অথচ চট্ করে একটা কিছু করতেও পারেনা।

কিছুক্ষণ কেটে যায়।

মেঝের উপর নন্তু বসে আছে মাথা নামিয়ে। ওর রুক্ষ চুলের কিছুটা ছড়িয়ে রয়েছে প্রশস্ত ললাটের উপর।

মায়া বিছানা ছেড়ে উঠে নন্তুর রুক্ষ চুলগুলি একটু আদর করে। সজ্জা-টেবিলের প্রকাণ্ড আয়নার সুমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে নিজের অবয়ব। বাঁ-কাঁধের আঁচলটা একটু সরিয়ে দেয়। স্নোর শিশিটার দিকে

হাত বাড়িয়ে কি মনে করে হাত টেনে নেয়। ছোট্ট একটা ব্যাগে টাকাপয়সা ভরে নিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে নন্তর সাথে ফুটপাতে এসে দাঁড়ায়। একটা টানা রিক্সায় চেপে ওরা কিছুক্ষণের মাঝেই এসে পড়ে নন্তদের বস্তিতে।

নন্তর সাথে সুসজ্জিতা মায়াকে রিক্স থেকে নামতে দেখে বস্তিবাসী অনেকেই এসে ভীড় করে।

বিছানার সাথে মিশে যাওয়া রবির জ্ঞানহীন দেহের দিকে চেয়ে ভয়ে মায়া শিউড়ে ওঠে। ও ক'খানা হাড় নিয়ে কি ভাবে বেঁচে আছে মানুষটা!

দরজার বাইরে কৌতুহলী বস্তিবাসী; ঘরে অচেতন রবি; মায়া একটু বিব্রতবোধ করে। শঙ্কা ও লজ্জা জোর করে একপাশে ঠেলে দিয়ে মায়া রবির শয্যাপাশে গিয়ে বসে। ছোট মেয়েটা এতক্ষণ ঘরের এককোনে বসে দু'চোখ মেলে মায়াকে দেখছিল। বাপের শয্যাপাশে বসতে দেখে সে হাঁমা দিয়ে এগিয়ে আসে। মায়ার সুমুখে এসে এক-মুঠি ধূলি ওর কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে আধোকণ্ঠে ডাকে,—মা!···

তারপর মায়াকে সময় না দিয়েই ধূলি-ধূসরিত নোংরা দেহ নিয়ে লাফিয়ে পড়ে মায়ার কোলে।

বাইরে থেকে একজন বয়িয়সী সুযোগ পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আবেগের বেটি! কাপড়টা যে নষ্ট করে দিলি। আর ওরই বা দোষ কি?—তোমাকে দেখে মা ভেবে গিয়েছে। দেখনা—কেমন চোখ বুজে কোলের উপর শুয়ে আছে। সেই ছেঁনাল মাগীর কিছুতেই ভাল হবেনা। অমন কচি মেয়ে ফেলে, এমন ব্যায়রামী স্বামী রেখে

কেউ কি অমন কাজ করে? বুঝলে বোন! দেখে নিও; সর্ব্বঅঙ্গ মাগীর খসে যাবে।

চেঁচামেচি শুনে মেয়েটা মায়াকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরে।

মাত্র দুটি ক্ষুদ্র বাহু-বন্ধনী; মায়ার বুক কেঁপে ওঠে। মেয়েটার নোংরা দেহ কোলের মাঝে চেপে ধরে মায়া। খোঁজে সান্ত্বনা। অনুভব করে একটা নূতন স্বাদ।

মায়া রবিকে নিয়ে এসেছে নিজের দোতালার একটি ঘরে। নূতন ডাক্তার লাগিয়েছে চিকিৎসায়. দামী ওষুধ, ইন্‌জেক্‌শান এবং মায়ার একাগ্র সেবায় রবির ব্যায়রাম একটু কম্‌তির দিকে।

প্রথমদিন ভাল হয়ে রবি আনত-মুখী, শুশ্রূষারত মায়াকে দেখে চম্‌কে উঠেছিল। উত্তেজনায় বিছানার উপর বসতে গিয়ে সে হাঁপিয়ে পড়ে। বিবর্ণ মুখে মায়া জোর করে রবিকে শুইয়ে দেয়।

টেবিল ফ্যানের হাওয়ায় রবির তেলহীন চুলগুলি লুটুপুটি খায়। কিন্তু তালু ফেটে রবির শুধু আগুনের শিষ্‌ই বেরোয়। কিছুতেই ভেবে পায়না; কি করে এখানে এল সে? কি করেই বা ক্ষেন্তি এল এখানে।

একটা সন্দেহ ওর মাথায় চন্‌কে ওঠে। নিঃশ্চয় মিনু ক্ষেন্তিদের দলে নাম লিখিয়েছে; মিনুর কাছ থেকেই খবর পেয়েছে ক্ষেন্তি। ঘৃণা ও ক্রোধে রবির সমস্ত দেহ কেঁপে ওঠে। মিনু কেন সাহস পায়না ক্ষেন্তির মত সুমুখে এসে দাঁড়াতে। অশক্ত স্বামীকে কি ভয় তার?

রবির শীর্ণ লম্বা আঙুলগুলি কাঁকড়ার ঠ্যাংএর মত লক্‌লকিয়ে ওঠে।

কয়েকটাদিন পর। সেদিন নন্তু বসেছিল বাপের পাশে। রবি অবাক বিস্ময়ে দেখে ছেলেকে। নূতন জামাকাপড়ে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে নন্তুকে। নিজের ছেলে বলে মনেই হয়না।

নন্তু বাপের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। রবি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, —নন্তু! এখানে কে কে রয়েছে রে?

—তুমি, আমি, ছোট খুকু, আর...

রবি অধৈর্য্য হয়ে বলে ওঠে,—আর তোর মা...মা!...

—মা! বিস্ময়ে নন্তু তাকায় বাপের মুখের দিকে। মাকে তুমি কোথায় দেখলে বাবা?

—মাকে তুমি কোথায় দেখলে বাবা? শয়তান!...নতুন জামা-কাপড়; আবার ওষুধ;—এমনিই উড়ে আসছে;—না! লুকুবার চেষ্টা; যেন আমি কিছু বুঝিনে। গর্জ্জে ওঠে রবি।

নন্তুর দু'চোখে জল এসে যায়। বলে,—

—মাকে কত খুঁজেছি, কোথাও খবর পাইনি। বস্তি থেকে আমাদের নিয়ে এসেছেন বড়-মা।

—বড়-মা! কে তোদের বড়-মা? বিছানার উপর উঠে বসে রবি।

—কেন? এই যে এতক্ষণ তোমার পাশে বসে ছিলেন। তিনিই ত আমাদের সব জামা কাপড় কিনে দিয়েছেন।

রবির মুখ ম্লান হয়ে যায়। অপলক দৃষ্টিতে নন্তুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ধীরে ধীরে বিছানার উপর শুয়ে পড়ে।

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে উৎকির্ণ হয়ে মায়া শুনছিল রবির কথাগুলি। রবিকে উচ্চবাচ্য করতে না দেখে ওর বুকে কিসের একটা ঝিলিক খেলে যায়।

যে রাত্রিরে ছগনলাল থাকে. সে রাত্রিরে মায়া অনুপস্থিত থাকে রবির শয্যাপাশ থেকে। একটা বুড়ি-ঝি রবিকে পাহারা দেয়।

সেদিন ছগনলাল আসেনি। মায়া এসে বসে রবির শয্যাপাশে।

টেবিল ফ্যানের হাওয়া অভ্যস্ত রবির ভাল লাগেনা। তাই কয়েক দিন যাবৎ একটা হাত-পাখা আনা হয়েছে। মায়া হাল্কা পাখাখানা হাতে নিয়ে রবিকে হাওয়া করতে থাকে।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে রবি। ঘরের অপরপাশে নন্তরা ভাই-বোন তক্তপোষের উপর শুয়ে আছে। বুড়ি-ঝি মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

মায়া রবির দেহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। দেহের সে পাংশুটে ভাব অনেক কমে গিয়েছে। মুখের উপরকার মৃত্যুপাণ্ডুর ছাপটা আর নেই।

মায়া কল্পনা করে নানা কথা। রবি যখন ধরা দিয়েছে, এসুযোগ আর ছাড়া চলবেনা। গয়না ও নগদে হাজার কয়েক টাকা রয়েছে হাতে। ছগনলালের কাছ থেকে নানা ছল করে আরও কিছু টাকা বের করে নিতে হবে। রবি ভাল হয়ে উঠলে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। চেৎলা কিংবা তিলজলার দিকে ছোট্ট একটা দোকান নিয়ে রবিকে বসিয়ে দেবে। সংসারের কাজ করার ফাঁকে নিজে গিয়েও সাহায্য করবে মানুষটাকে। নন্তকে ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে।

মায়ার দু'চোখ কল্পনার আনন্দে চিক্ চিক্ করে।

দিন কয়েক পর ; রাত দুপুর। চারিদিক নিরব নিথর। শুধু বুড়ি ঝির নাক ডাকানোর একঘেঁয়ে বিভৎস শব্দ শোনা যায়।

ঘুম ভেঙ্গে যায় রবির। মুখের উপর হাতপাখা পড়ে আছে। রবি

পাখা ঘুরিয়ে দেয়। চারপাশে ভাল করে তাকায়। বালিশের বা-পাশে নজর পড়তেই সে চম্‌কে ওঠে।

রবির বালিশের কোনে মাথা রেখে মায়া ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ঠোঁটের কোনে খেল্‌ছে একটুকরো স্বপ্নময় হাসি।

বড় সুন্দর, বড় মধুর দেখাচ্ছে ক্ষেন্তিকে। বছরের ব্যবধানে ক্ষেন্তি কত মোহমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত দেহে যেন ডাকছে প্রাচুর্য্যতার বান।

সেবা, নিঃশ্চিন্তি ও প্রাচুর্য্যের মাঝে পড়ে রবি ভাবে এ জীবনটাই বা মন্দ কি? ক্ষেন্তিকে ত এখন আর খারাপ লাগেনা। বরং সেবা শুশ্রূষার মাঝ দিয়ে ক্ষেন্তি অনেক আপন হয়ে উঠেছে। এখন ওষুধ পথ্যের সময় পেরিয়ে গেলে রবি উন্মুখ হয়ে যায় ওর জন্য।

রবি একটু ঝুঁকেই চম্‌কে যায়। বড় অসময়ে মিনুর মলিন মূর্ত্তি একটা তীব্র দ্যুতির মত রবির দু'চোখ ঝল্‌ছিয়ে দিয়ে যায়।

রবি দাঁত চেপে মায়ার কাছ থেকে সরে আসে। কিন্তু পরক্ষণেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ওর মন। মিনুর কথা কেন সে ভাববে? কেন সে পিছিয়ে আসবে? স্বামীকে ব্যায়রামে অশক্ত দেখে, কচি শিশুসন্তান ফেলে যে পালাতে পারে, সে নারীর কথা সে ভাবতে চায়না। সেই সাথে ক্ষেন্তির প্রতি কৃতজ্ঞতায় রবির মন ভরে ওঠে। কি দরকার ছিল ওর রবিকে আশ্রয় দেবার; অত চিকিৎসা করে ভাল করে তোলার?

আরও কয়েক রাত পরে। এখন রবি অনেকটা সেরে উঠেছে। ঢুলে ঢুলে রবির মাথায় হাওয়া কচ্ছিল মায়া। দেয়াল ঘড়িতে দু'টো বাজতেই রবির ঘুম ভেঙে যায়।

মায়ার হাতের পাখাটা এক একবার বিছানার উপর নেমে আসছে। আবার অভ্যেসবশে সক্রিয় হয়ে উঠছে।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে রবি মায়ার হাত থেকে পাখাটা নেবার জন্য হাত বাড়ায়।

মায়ার তন্দ্রা ছুটে যায়। রবির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে সোজা হয়ে বসে হাওয়া করতে থাকে।

রবি চোখ বুজে। সময় কেটে যায়।

হঠাৎ রবি মায়ার একটা হাত চেপে ধরে।

মায়ার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ দিয়ে ওঠে। সস্নেহে রবির কপালে হাত রেখে মায়া বলে,—ঘুমিয়ে পড় দিকি ঘরামি। মাথায় হাওয়া কচ্ছি। অসুস্থ শরীর নিয়ে পাগলামো করতে হবেনা।

সেই প্রায় এক যুগ আগেকার হারিয়ে যাওয়া ঘরামি ডাক। কৈশর ও যৌবনের শত স্মৃতি ঐ ডাকটির সাথে রয়েছে জড়ান। মায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রবি আন্‌মনা হয়ে পড়ে।

মায়া পাখাটি তুলে নিয়ে দ্রুত হাওয়া করে।

১৫

পুরো তিনদিন পর জ্ঞান ফিরে আসে মিনুর। নাকে এসে ঢোকে ওষুধের তীব্র গন্ধ, চোখ মেলে চারপাশে তাকায়। ধব্ধবে ছাদ, পিঠের নীচে উষ্ণ কোমল বিছানা. মস্তিষ্কে দারুণ অবসাদ।

এ কোথায় সে পড়েছে ? ভীতত্রস্ত মনে নড়তে গিয়ে অনুভব করে দেহের প্রতি রন্ধ্রের দুঃসহ ব্যথা।

—নড়াচড়া করোনা। একজন নার্স এসে ওকে সাবধান করে দিয়েই চলে যায়।

আকুল দৃষ্টিতে মিনু তাকায় চারপাশে। রুগ্ন রবি, নন্তু কিংবা ছোট মেয়েটা কাউকে যে দেখা যায়না। ওরা সব কোথায় ?

ধীরে ধীরে মনের মনিকোঠায় ভেসে ওঠে দাদাবাবুর ঘরের সে অসহ স্মৃতি...মটোরের ব্রেক কষা...

ভয়ে ভয়ে মিনু পরীক্ষা করে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নাক, চোখ, কান, গাল, হাত, বুক ও পেট সবই যে ঠিক আছে। কম্বলের ফাঁক দিয়ে পায়ের উপর নজর পড়তেই দারুণ ত্রাসে চম্‌কে চিৎকার করে ওঠে মিনু। একটা পায়ের যে হাঁটু থেকে আর নেই।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মিনু নীল হয়ে যায়। চারপাশ থেকে নার্সরা দৌড়ে আসে।...

ধীরে ধীরে দুটি মাস কেটে যায়। মিনুর পায়ের ঘা শুকিয়ে

গিয়েছে। কাল হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারেনা মিনু। রবির অবস্থা কল্পনা করতে বসে শিউড়ে ওঠে। ছেলেমেয়েদুটি না জানি কি অবস্থায় পড়ে আছে? তবুও বহুদিন বাদে একত্রিত হতে পারার কল্পনায় আনন্দিত হয় মিনু। কিন্তু নিজের কাটা পায়ের দিকে নজর পড়তেই সব আনন্দ ফুরিয়ে যায়। দু'চোখের জলধারা বাধাহীন হয়ে নেমে আসে। এ দেহের বোঝা এখন কে বয়ে বেড়াবে? অশক্ত স্বামীর সংসারে অশান্তি যে বেড়েই যাবে।

মিনু কাঁদে ফুঁপিয়ে। বদ্ধ উৎসমুখ খুলে গিয়েছে যেন। কান্না তার থামতে চায়না। হাসপাতালের শক্ত বালিশ ভিজে যায়। ফুরিয়ে আসে রাত।

উল্টোডাঙ্গার বস্তির কাছটিতে মিনুকে নামিয়ে গাড়ী যখন চলে গেল, তখন বেলা হয়েছে অনেকটা। ভীতমনে দু'হাতের উপর ভর করে নিজের ছোট্ট ঘরখানার দাওয়ায় উঠে আসে মিনু।

মিনুকে এ অবস্থায় দেখে বস্তিবাসীরা স্তব্ধ হয়ে যায়। এমনটি যে তারা ভাবতেও পারেনি। সবাই মুখ চাওযা-চাওয়ি করে। নতুন লোক এসে গিয়েছে ঘরে। তারা বিস্ময়ে মিনুর চারপাশ ঘিরে দাঁড়ায়।

কেঁপে ওঠে মিনুর মন।

বস্তির একজন পুরোনো বাসিন্দা এগিয়ে আসে। মিনুকে জিজ্ঞেস করে, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? এ অবস্থা কি করে হ'ল?

ব্যাকুলকণ্ঠে মিনু জিজ্ঞেস করে, ওরা সব কোথায় মধু-দা?

—ওরা এখান থেকে চলে গিয়েছে। রবির গাঁয়ের কে জন!—মেয়েছেলে দেখতে খুব সুন্দরী। সে এসে নিয়ে গেছে।

মিনু একটা ভীতির হাত থেকে রেহাই পায়। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে বলে, ওদের ঠিকানাটা দিন—

—ওদের ঠিকানা ত আমরা কেউ রাখিনি।

মিনু আঁৎকে ওঠে।—ঠিকানা রাখেননি কেউ; ওরাও ঠিকানা দিয়ে যায়নি? এত বড় কলকাতায় কোথায় গিয়ে খুঁজব ওদের?

ভয় ও অভিমানে মিনুর দু'চোখ ফেটে জল বেরোয়।

ভিড় সরে যায়।

মিনুর চোখ থেকে দুনিয়ার আলো যেন সরিয়ে নিয়েছে। বিহ্বল হয়ে সে বসে থাকে কিছুক্ষণ। কিন্তু বসে থাকলে যে চলবেনা। রবিকে খুঁজে বের করতেই হবে।

দু'হাতে ভর করে মিনু রাস্তায় নেমে আসে। রৌদ্রতপ্ত ফুটপাথের উপর দিয়ে ওর কোমল হাত দাগ কেটে এগিয়ে চলে। মিনুর গতির সাথে পরিপূর্ণ উপরাঙ্গের আন্দোলনের দিকে চেয়ে পথচারীদের দৃষ্টি লোভাতুর হয়ে ওঠে।

হাতের তালুতে পড়ে ফোস্কা। সমস্ত শরীর ভিজে যায় ঘামে। ক্ষিধেয় পেটের নাড়ী পাক খায়। অভ্যেসবশে মিনু আঁচলে হাত দেয়। রিক্ত হাত নেমে আসে।

রোদ্দুরে আর চলা যায়না। মিনু ফুটপাথের ছায়াশীতল নিরিবিলি একটা কোন দেখে বিশ্রাম নেয়।

সূর্য্যের তেজ এসেছে কমে। মিনুর পথচলা আবার আরম্ভ হয়। রাতদুপুর পর্য্যন্ত কলকাতার বহু রাস্তা ঘুরে নিরাশ হয়ে যায় মিনু। পরিশ্রমে হাতদুটি অবশ হয়ে গিয়েছে। হাতের ফোস্কাগুলি ফেটে গিয়ে জ্বালা করে।

রাত কাটাবার জন্ত মিনু ফুটপাথের উপর থেকে গেঁথে তোলা একটা বাড়ীর বারান্দায় উঠে যায়। নিজের রুক্ষ প্রকাণ্ড খোঁপাটাকে বালিশের মত রেখে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

সবে ঘুমটা জমে উঠেছে। কানের পাশে চেঁচামেচি শুনে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

—যত সব নচ্ছার মাগীর ঘুমুবার যায়গা যেন এখানে। নেমে যা মাগী ··নেমে যা···

প্রকাণ্ড বাড়ীর দরজা খুলে গালাগালি দিচ্ছে একজন বাবু। ভয় পেয়ে মিনু উঠে বসে। দু'হাতের উপর ভর করে নেমে যায় ফুটপাথে।

পুরো চারটি দিন খুঁজেও রবির কোন সন্ধান পাওয়া যায়না। নিরাশায় ভারাক্রান্ত, ক্ষিধেতে দুর্ব্বল, পরিশ্রমে ক্লান্ত বিহ্বল মন নিয়ে মিনু একটা লাইট-পোষ্টের গায়ে ঠেস্ দিয়ে বসে। ধীরে ধীরে মাথাটা ঝুঁকে আসে বুকের উপর।

—হাতটা মেলে ধর বাপু।

মিনুর তন্দ্রা টুটে যায়। সুমুখে দাঁড়িয়ে একজন পুণ্য-লোভাতুরা বৃদ্ধা তুলে ধরেছে একটা এক আনি।

দু'দিন যাবৎ পেটে কিছু পড়েনি, চারটে পয়সা·· এক ঠোঙ্গা মুড়ি। মিনুর ডান হাতটা এগিয়ে যায়।

বৃদ্ধা পয়সা দিয়ে চলে যায়। পয়সাটা মুঠিতে চেপে ধরে বহুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে থাকে মিনু। চোখ ভিজেই শুকিয়ে যায়। ধারা আর নাবেনা।

যত্নহীন মাথা উকুনে ভরে গিয়েছে। ভিক্ষা করতে বসে মাথার চুলকুনীতে অস্থির হয়ে যায় মিনু। বিরক্ত হয় সে চুলের গুচ্ছের উপর। ঐ একটা বোঝা বয়ে বেড়াবার প্রয়োজন ত ফুরিয়ে গিয়েছে। ভিক্ষালব্ধ দুটি পয়সা হাতে নিয়ে রাস্তার নাপিতের কাছে গিয়ে খোঁপটা কেটে আসে সে।

একই অঞ্চলে বসে থাকলে রোজগার কমে যায়। মিনুকে ঘুরতে হয় এ অঞ্চল থেকে সে অঞ্চলে। সেদিন মাণিকতলা বাজারের ধারে বসবার জন্য মিনু যাচ্ছিল সার্কুলার রোড ধরে দেহটাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে। ঝরঝর করে নামে আকাশ থেকে জল। মিনু চারপাশে চেয়ে খোঁজে মাথা গুঁজবার স্থান।

একটা বাড়ীর ঢাকা-বারান্দা নজরে পড়ে। বাড়ীর কয়েকটি ছেলে-মেয়ে বসে গল্প করছিল সেখানে। মিনু বারান্দার এককোনে এসে আশ্রয় নেয়। ছেলেমেয়েরা চোখ ফিরিয়ে দেখে নিয়ে ডুবে যায় নিজদের গল্পের মাঝে।

বৃষ্টির সাথে জোর হাওয়া বইতে থাকে। জলের ছাট এসে বিঁধে শরীরে। একটু ভেতরে সরে বসে মিনু।

ছেলেদের গল্প থেমে যায়। ওরা একসাথে চিৎকার করে,—এই··· এই···ভেতরে ঢুকবিনে। বসবার যায়গা পেয়েছে এখন শোবার যায়গা খুঁজছে।

একটি ছেলে অন্যান্তদের টেক্কা দেয়। সে বলে,

—জানিস্! গত হপ্তায় আশীজন কলেরা রোগী হাসপাতালে মারা গিয়েছে। এসব হা-ঘরে ভিক্ষুকরা হচ্ছে এর মূলে। ড্রেন ও ডাষ্টবিন থেকে কুড়িয়ে খায় যত সব ফেল্না জিনিষ। রোগ-জীবাণুও

খেয়ে ফেলে সে সাথে। একবার কোথাও বমি করলেই হোল। চারপাশের লোকজনের আর রক্ষা নেই।

—ওদের কিছু হয়না? বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মিন্নুকে দেখে নিয়ে আর একটি ছেলে প্রশ্ন করে।

—ওদের আবার কি হবে? ড্রেন-ডাষ্টবিনের কি কিছু হয়? ওরা যে ঐ...

—ধেৎ! আমার বিশ্বাস হয়না। প্রশ্নকারী প্রতিবাদ করে।

—সেদিন বাবা বলছিলেন মাকে। তুই তা'হলে বাবার চেয়ে বেশী জানিস্?

বাবা বলেছে এর উপর আর কথা চলতে পারেনা। প্রতিবাদকারী ছেলেটি চুপ মেরে যায়।

মিন্নু হাঁ করে শুনছিল ছেলেদের কথা। যে ছেলেটা তত্ত্ব কথা শোনাচ্ছিল, ওর চেহারা অনেকটা যেন নন্তুরই মত! অন্ততঃ চিবুক ও চোখজোড়া ত বটেই।

বাইরে জলের জোর বেড়ে উঠেছে! মিন্নু জলধারার দিকে তাকিয়ে ভাবে অতীত দিনগুলির কথা। ধীরে ধীরে ঝাপ্সা হয়ে আসে ওর চোখের দৃষ্টি।

আঁড়চোখে মিন্নুর উপর নজর রেখে কি যেন ফিস্‌ফিস করে ছেলে-মেয়েরা।

একটি মেয়ে পাণ্ডা ছেলেটিকে বলে।

—দেখছো বাবুলদা। ও বেটি কেমন করে তোমার দিকে তাকাচ্ছে। যেন গিলে খেতে চায়। ডাইনিও কিন্তু হতে পারে। কিন্তু...

নন্তুর মত ছেলেটি ভেংচি কেটে হাঁক দেয়, এই...এই...নেমে যা—

সস্নেহ দৃষ্টি ছেলেটিব মুখের উপর স্থাপন করে মিনু বলে, চলে যাব বই কি বাবা! জলটা ধরলেই আর থাকবনা।

মিনুর নির্লিপ্ততায ছেলের জেদ্ বেড়ে যায। পবামর্শ করে ভেতর থেকে কযেক বাল্তি জল নিয়ে আসে ওরা।

বাব্লু মিনুর দিকে এগিযে এসে বলে,

—এই নেমে যাবি কিনা বল্?

উত্তর দেওযার চেয়ে চুপ করে থাকাই সমীচীন মনে করে মিনু।

হঠাৎ কযেক বালতি জল এসে আছড়িয়ে পড়ে মিনুব দেহের উপর।

—এখন কেমন মজা? গোঁয়ার্তুমি আমার সাথে! এখনও নেমে যা বলছি—

কর্কশকণ্ঠে মিনুকে শাসিযে একটা খালী বালতি নামায বাব্লু।

ভেজা কাপড়ে ঠাণ্ডা হাওযা কাঁপিযে তোলে মিনুর সর্ব্বঅঙ্গ। কযেক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে চোখ বেযে। ব্যথিত দৃষ্টিতে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে দু'হাতের উপর ভর দিযে মিনু নেমে যায বৃষ্টির মাঝে।

কযেকদিন পবেব এক সকাল। পূব আকাশ সোনালী বঙে রাঙা। টুকরো টুকরো সাদা মেঘেব গাযে লালেব ছোঁযাচ। গোল হযে উড়ছে পোষা পায়রার ঝাঁক্।

মিনু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল মন্থরগতিতে। মাড়োযারীর বাড়ীতে খিঁচুবী খাওযাবে দুপুরে, খবর পেযে নিশ্চিন্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে মিনু। আজকে আর রাস্তার ধারে বসতে হবেনা।

এদিকে ছোট বোনেব বিস্কুট কেনার জন্য নন্তু যাচ্ছিল দোকানে। কৌতূহলী হযে সে তাকায খঞ্জ ভিক্ষুণীর দিকে। চম্কে ওঠে নন্তু। বিশ্বেস করতে চাযনা তার মন। দু'হাত দিযে রগড়ে নেয চোখ।

মিনু ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছে কিছুটা। নন্তু ছোটে পাগলের মত, মিনুর সুমুখে লাফিয়ে পড়ে বন্ধ করে দেয় তার দু'হাতের সঞ্চালন।

চোখ বোজে মিনু। এ দুঃস্বপ্ন সে দেখতে চায়না।

নন্তু জড়িয়ে ধরে তার হারিয়ে যাওয়া মাকে। মায়ের দুর্দ্দশা দেখে মূক হয়ে গিয়েছে তার ভাষা। মিনুর দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে আনন্দাশ্রু।

নন্তু মাকে নিয়ে আসে বাড়ীতে। ওর হাঁকাহাঁকিতে মায়া ও রবি বেরিয়ে আসে।

—মাকে ধরে নিয়ে এলাম বাবা! আনন্দ যেন চেপে রাখতে পারেনা নন্তু।

এ অবস্থায় মিনুকে দেখে শিউরে স্তব্ধ হয়ে যায় রবি। বিস্ময়ে অবাক হয় মায়া।

স্বামীকে ব্যায়রাম থেকে ভাল হয়ে উঠতে দেখে আনন্দিত হয় মিনু। কিন্তু মায়ার দিকে ও চারপাশ লক্ষ্য করে ওর আনন্দ উবে যায়। চিরকাল বস্তিতে বাস করেও মায়ার এ জীবনধারা ওর কাছে অজ্ঞাত নয়। কেমন যেন একটু ভয় করে ওর।

মায়া দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছিল স্থানুর মত। ধীরে ধীরে ঠোঁটদুটি ওর বেঁকে যায়। চোখদুটা জলে উঠেই ম্লান হয়ে যায়। ঠোঁটের ভাঁজও স্বাভাবিক হয়ে আসে। মুখে এক টুকরো হাসি টেনে সহজকণ্ঠে মায়া বলে ;—তোদের ঘরে তোর মাকে নিয়ে যা নন্তু। ঘরে যাও বোন!

—আমি—আমি! মিনু তাকায় স্বামীর মুখের দিকে। রবি মাথা

নীচু করে কি যেন ভাবছে। মিনুর চোখে চোখ পড়তেই একটু ইতস্ততঃ করে রবি ঘরের ভেতর সরে আসে।

—চলো মা! নন্তু মিনুর হাত ধরে টানে।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মিনু মায়ার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নন্তুকে বলে,—চল্—

মিনু এসে ঘরে ঢুকতেই রবি চম্‌কেই সাম্‌লে নেয়।

মিনুর দৃষ্টিতে এটুকুন এড়ায়না। দু'চোখ তার ভরে যায় জলে।

রবি কেন এমন কচ্ছে? একবার ত এসে শুনালনা একটা সান্ত্বনার কথা; একবার ত জিজ্ঞেস করলনা কিছু।

মিনুর চখে জল দেখে রবির মনেতে নাড়া লাগে। সে জিজ্ঞেস করে;—এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? এ অবস্থা হ'ল কি করে?

মিনু স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। মনে পড়ে দাদাবাবুর কাছে যাওয়ার কাহিনী। পাংশু হয়ে ওঠে ওর শুষ্কমুখ। একবার ইচ্ছা হয় রবির কাছে সব খুলে বলে মনটা খোল্‌সা করে নিতে। কিন্তু আজকের পরিপ্রেক্ষিতে সাহস পায়না সে। শুধু বলে দুর্ঘটনা ও হাসপাতালের কথা।

অবিশ্বাস রবি করেনা, কিন্তু বিশ্বাস করে উতলা হয়েও ওঠেনা। মিনুর উপর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

যেদিন থেকে মিনু এসেছে মায়ার সংসারে, সেদিন থেকে একটা থম্‌থমে ভাব নেমেছে সংসারের উপর। মায়াকে ত তার ঘরের বাইরে বড় একটা দেখাই যায়না। রবি থাকে সর্ব্বদা আন্‌মনা ও চিন্তিত।

স্ত্রীর প্রতি একটা দরদ, ভালবাসা ও কর্ত্তব্য রবি অস্বীকার করতে পারেনা। সহজ হতে চায় সে। কিন্তু স্ত্রীর ঐ পঙ্গু দেহটা নিয়ে কিভাবে চলবে সে? সে সামর্থ্যই বা আজ তার কোথায়? দুর্ব্বল শরীরে আবার আটঘণ্টা করে ডিউটি দেওয়া এবং ব্যায়রামে পড়ে বিনিচিকিৎসায় তিলে তিলে মরা ;—কল্পনায় শিউড়ে ওঠে রবি।

এদিকে ক্ষেন্তির ভালবাসা, সেবা, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি, ওর আশ্বাসে ভরা ঘর বাঁধবার সাধ রবিকে বিরাট আবর্ত্তের মাঝে ফেলে দেয়।

স্বার্থপর রবি নয়। কিন্তু দুর্ব্বল শরীর নিয়ে আজ সে দ্বিধাগ্রস্ত ও ভীত।

অসম্ভব! মায়া পারেনা মিনুকে সহজ করে গ্রহণ করতে। তাছাড়া এতটা এগিয়ে এসে পিছিয়ে আসতে রাজী নয় মায়া। মিনুর সুমুখ থেকে রবিকে ছিনিয়ে নিতেও কোথায় যেন বাঁধে। এক একবার ইচ্ছা হয় ওদের তাড়িয়ে দিয়ে সব ধুয়ে ফেলবে মন থেকে। কিন্তু এ ক'দিনের সান্নিধ্যে রবির সাথে প্রভেদটা যে মুছে গিয়েছে।

ছট্‌ফট্‌ করে মায়া। এভাবে দিনের পর দিন সহ্য করা যে অসম্ভব।

সেদিন দুপুরে মিনু ঘুমিয়েছে ঘরে। মায়া এসে রবিকে ডাক দেয়।

রবি বোধহয় এরই প্রতীক্ষাতে ছিল। মিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে বেরিয়ে আসে সে।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যায় মিনুর। পাশে তাকিয়ে রবিকে না দেখে মনটা কেমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে। দু'হাতে ভর করে সে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

মায়ার ঘর থেকে আসছিল মৃদু কণ্ঠের আলাপন। মিনু একটা জানালার নীচে গিয়ে বসে।

ঘরের মাঝে ফিস্ ফিস্ করে বলছে রবি, আমি আর ভাবতে পারিনে ক্ষেন্তি! মিনুর দিকে তাকালে দুঃখ হয়, তোমাকে ছেড়ে যাওয়াও যে অসম্ভব। তুমিই বাঁচিয়েছ আমাকে, তুমিই পথ বাৎলে দাও।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করে মিনু। কান দুটা ওর ঝাঁ ঝাঁ করে।

বহুক্ষণ পর মায়ার ক্ষীণ কণ্ঠ ধ্বনিত হয়।

—তোমার সাথে আর দেখা না হলেই বোধহয় ভাল ছিল স্বামী— নিঃশব্দে ফিরে আসে মিনু। দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরোয়। মনের মাঝে নানা কথা পাক খেয়ে ওঠে। ঐ বারনারীকে ভালবাসতে যদি রবির না বাধে, তা'হলে ত তাকে আজ এ অবস্থায় এসে পড়তে হ'ত না। সৌন্দর্য্য ত তার মায়ার চেয়ে কম ছিল না। যে স্বামীকে বাঁচবার জন্য সে নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল, এ ক'টা দিনের ব্যবধানে সেই স্বামী আজ নাগালের বাইরে। কেন এমন হ'ল ? হঠাৎ কাটা পায়ের দিকে নজর পড়তেই মিনুর দু'চোখ ভিজে যায়।

অঘোরে ঘরের মাঝে ঘুমুচ্ছে নন্তু, পাশেই ছোট মেয়েটা। স্বচ্ছলতার মাঝে আদর ও যত্নে এ ক'দিনেই ওদের স্বাস্থ্য বেশ ফিরে গিয়েছে। বেশ সুখে আছে ওরা।

ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা নাড়ে মিনু। না— সেত পারেনা পঙ্গু দেহ নিয়ে সবাইর দুঃখের বোঝা বাড়াতে। সুখে থাক্ সবাই, দুঃখ নিয়ে চলে যাবে একা।

নন্তুর কপালের উপর ঐকটা স্নেহ-চুম্বন এঁকে দেয় মিনু। ঘুমের মাঝে নন্তু মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে।

এ বাহুবন্ধনী যে ছাড়াতে চায়না মিনু। দৃষ্টি তার ঝাপ্সা হয়ে আ'সে। নন্তুর কপালে গাল চেপে মিনু শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

হঠাৎ চম্‌কে ওঠে মিনু। একি সে করছে? না—না—ওরা সুখে থাক্। ওরা বেঁচে থাক। কাঁটার মত সে কিছুতেই বিঁধে থাকবে না ওদের মাঝে।

দুঃসহ একটা যাতনায় মিনুর সর্ব্বঅঙ্গ কাঁপে থর থর করে। এখনই বুঝি কান্নায় ভেসে যাবে সমস্ত সঙ্কল্প। ভয়ে মিনু নন্তুর হাত গলা থেকে নামিয়ে দু'হাতের উপর ভর করে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে।

*   *   *   *

রবি ফিরে এসে দেখে মিনু নেই ঘরে। চম্‌কে ওঠে সে।

রাত এগিয়ে যায়, মিনু ফেরেনা।

খোঁজাখুঁজিই সার। মিনুকে পাওয়া যায়না কোথাও। নন্তু কাঁদছে অঝোরে। ছোট মেয়েটিকে বুকে চেপে মায়া বসে আছে চুপ করে।

রেলিংএর উপর ভর করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবি। চারপাশ বড় ফাঁকা শুধু চোখদুটো ওর জ্বালা করে।

পেছন ফিরে তাকালে কলকাতা সহর আর দেখা যায়না। ব্যারাক-পুর ট্রাঙ্ক রোডের পাশে বিরাট এক বট-গাছের নীচে বসে মিনু ওর নোংরা কাপড়ে চোখ ঢাকে।

— ০ —